মানুষ মানুষ খেলা

মাহমুদুল হক

মানুষ মানুষ খেলা

www.nagorikpathagar.org

Manus Manus Khela

Short Stories by

Mahmudul Hoque

www.nagorikpathagar.org

মানুষ মানুষ খেলা

মাহমুদুল হক

www.nagorikpathagar.org

সন্দেশ
ISBN-984-70209-0039-1
মানুষ মানুষ খেলা
মাহমুদুল হক

স্বত্ব © হোসনে আরা মাহমুদ

প্রথম প্রকাশ : চট্টগ্রাম বইমেলা, মার্চ ২০০৯

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

সন্দেশ, বইপাড়া, ১৬ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০ থেকে
লুৎফর রহমান চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত
E-mail : sandesh.publication@live.com

কম্পোজ : সোহেল কম্পিউটার ৫০১/১ বড় মগবাজার, বেপারি গলি, ঢাকা-১২১৭
চৌকস প্রিন্টার্স : ১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।
পরিবেশক : বুক ক্লাব ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

বাংলা ভাষার অনুবাদস্বত্ব বা সর্বস্বত্ব প্রকাশক সন্দেশ কর্তৃক সংরক্ষিত। বাংলা ভাষার কপিরাইট অধিকারীর পূর্ব অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনার কোনো অংশ বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ড বা অন্য কোনো উপায়ে রিপ্রোডিউস বা সংরক্ষণ বা সম্প্রচার করা যাবে না।

১৩৫.০০ টাকা

www.nagorikpathagar.org

উৎসর্গ

শহীদ সাবের

www.nagorikpathagar.org

লেখকের আরো বই

অনুর পাঠশালা
নিরাপদ তন্দ্রা
জীবন আমার বোন
খেলাঘর
কালো বরফ
অশরীরী
পাতালপুরী
মাটির জাহাজ
চিক্কর কাবুক
প্রতিদিন একটি রুমাল
ও
নির্বাচিত গল্প

www.nagorikpathagar.org

যেটুকু বলা প্রয়োজন

মানুষ মানুষ খেলা বইটি প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল ১৯৯৬ সালের বইমেলায়। ৯৫ সালের মাঝামাঝি এমন কথাই হয়েছিল বটু মামার সাথে। সাথে ছিলেন আমার মামা মহিউদ্দিন আল মাহমুদ। উনিই আমাকে অনেক বলেকয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন মাহমুদুল হকের বাসায়। কারণ আমি জানতাম মাহমুদুল হক বই প্রকাশের ব্যাপারে অতটা আগ্রহী নন। আমি মামাকে বলেছিলাম– আমি কিন্তু ঘুরতে পারব না। মামা বলেছিলেন– তোকে ঘুরতে হবে না, আমি এসে সব ঠিক করে দিয়ে যাব। তুই ঠিকানা বের করে রাখিস। মামা থাকেন চাটগাঁ তবে প্রায়ই আসতেন অফিসের কাজে।

অনেক খোঁজাখুঁজি করে মাহমুদুল হকের ঠিকানা আর ফোন নম্বর সংগ্রহ করে রাখলাম। মামা ঢাকা আসলে ফোন করে একটা সময় ঠিক করে নিলেন। কারণ সপ্তাহের দুইদিন উনি ঢাকায় থাকেন না। নির্দিষ্ট দিনে দুপুরের পর মামাকে নিয়ে বটু মামার হাতিরপুলের বাসায় গেলাম। তখন তিনি ইষ্টার্ন মল্লিকার (মল্লিকা সিনেমা হল ভেঙ্গে যে মার্কেট হয়েছে) পাশের গলিতে থাকতেন। তার সাথে সেদিনই আমার প্রথম দেখা। মামা তাঁর সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এরপর শুরু তাদের দু'জনের গল্প। আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ নেয়ার ফাঁকে আজিমপুরের সে সময়কার গল্প যখন তাঁরা একই এলাকায় পাশাপাশি ছিলেন। এক সময় পাশাপাশি থাকা মানুষের মধ্যে যে কী রকম আত্মীয়তা হতে পারে তার নিদর্শন দেখলাম। সম্ভবত প্রায় ত্রিশ বছর পরে তাঁদের দু'জনের আবার সাক্ষাৎ। তাঁদের এ সম্পর্কের কারণেই আমিও মাহমুদুল হককে মামা ডাকতাম। তাঁদের আলাপচারিতায় বুঝলাম বটুমামা আমার আত্মীয়-স্বজন প্রায় সকলের সাথেই পরিচিত। তাঁদের এ আলাপচারিতার মাঝখানেই মামা আমার প্রকাশনা ব্যবসার প্রসঙ্গ টানলেন এবং তাঁকে অনুরোধ করলেন পাণ্ডুলিপি দেয়ার– সন্দেশ থেকে একটি বই প্রকাশের জন্য।

আমি স্পষ্ট বুঝলাম তিনি বিরক্ত হলেন। এতক্ষণ ভালোই ছিলেন। বললেন– আমাকে অগ্রিম টাকা দিতে হয়, তাছাড়া আমার বই তো চলে না, শুধু শুধু কেনো ও টাকা নষ্ট করতে যাবে! মামা বললেন– দেখ ভাগিনা আসতে চায়নি, আমি ওকে নিয়ে এসেছি। আমাকে বেইজ্জত করো না, অগ্রিম টাকা লাগলে ও তোমাকে দিবে তবু তোমাকে বই দিতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

এরপর তিনি বললেন– লেখালেখিতে এখন আমার আর আগ্রহ নেই। বটু মামা আমাকে বুঝানোর চেষ্টা করলেন তার বই প্রকাশ না করার জন্য। আমি তাকে অগ্রিম টাকা দেব এবং তার বইও প্রকাশ করব এমন দৃঢ়তা প্রকাশ করলে তিনি সন্দেশ থেকে কার কার বই প্রকাশিত হয়েছে, কার কার বই প্রকাশিত হবে জানতে চাইলেন। মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র বই প্রকাশ করেছি কিনা সেটাও জানতে চাইলেন। কারণ মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ও আমার মামা। এসব কথাবার্তার মাঝে হঠাৎ তিনি আমার হাতের আঙুলে পড়া দুটি আঙটির দিকে মনোনিবেশ করে জানতে চাইলেন এগুলো কার পরামর্শে হাতে দিয়েছি। পরামর্শকের নাম বলার পর তিনি আঙটি দুটি ভালো করে নেড়েচেড়ে দেখে আমার হাতেও কি যেন দেখলেন। তারপর একটুকরো কাগজ নিয়ে কী যেন লিখলেন। কাগজটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন– পারলে এটা ব্যবহার করো দুর্দশা কেটে যাবে। তবে তোমার হাতের ক্যাটস আইটা রেখো। আমি অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণায় একটু বিব্রত হয়ে পড়েছিলাম। তাই সাথে সাথে কাগজের টুকরোটা খুলে না পড়ে বই প্রকাশনা বিষয়ে আবারো কথা বলতে চাইলে তিনি বললেন তার হাতে কোনো পাণ্ডুলিপি তৈরি নেই। তবে বিভিন্ন কাগজে প্রকাশিত তাঁর লেখা প্রায় ১৫০টির মতো গল্প তিনি জমা করেছিলেন। কিন্তু মামী নাকি একদিন সেগুলো কাগজওয়ালার কাছে সের দরে বিক্রি করে দিয়েছেন। আমি নিরাশ না হয়ে তাঁকে সে কাগজগুলোর নাম এবং আনুমানিক প্রকাশকাল বলতে অনুরোধ করলে তিনি যে কয়টি পত্রিকার নাম দিয়েছিলেন সেসব পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করা গল্পগুলোর সংকলনই **মানুষ মানুষ খেলা**।

গল্পগুলোর কয়েকটি সে সময় আমি এবং মঞ্জু (আহসান উদ্দিন আল-মাহমুদ) বাংলা একাডেমী, পাবলিক লাইব্রেরি ও বিভিন্ন পত্রিকা অফিস থেকে হাতে লিখে ও ফটোকপি করে সংগ্রহ করেছিলাম। একটি গল্প দিয়েছিল রোদ্দুর সম্পাদক সালাম সালাহুদ্দিন। কম্পোজ করে সংশোধন ও সম্পাদনার জন্য তাঁকে দিলে তিনি বইটির নাম দেন **মানুষ মানুষ খেলা**।

প্রথম প্রুফে দু'একটি গল্প বাদও দিয়েছিলেন মাহমুদুল হক। এর মধ্যে তাঁর অনুমতি নিয়ে সমর মজুমদারকে বলি কভার করার জন্য। সুন্দর একটি কভার করে দিয়েছিলেন সমরদা। সে কভার দেখে মাহমুদুল হক বলেছিলেন– লুৎফর কভারটি আমার খুব পছন্দ হয়েছে, তুমি খুব ভাগ্যবান, কারণ কখনোই আমি আমার কোনো বইয়ের কভার প্রথম দেখাতেই পছন্দ করিনি– বলে তিনি ডিজাইনটি তাঁর কাছেই রাখতে চাইলেন।

বিপত্তির শুরু দ্বিতীয় প্রুফ দেখার সময় থেকে। দেই-দিচ্ছি-দেখছি বলে সময় পার করতে থাকেন মাহমুদুল হক। এক সময় ফোন ধরে আমার কণ্ঠ শুনলেই লাইন কেটে দিতে লাগলেন। এমনকি আবারো ফোন করতে পারি আশঙ্কায় তখন ফোন উঠিয়ে রাখতেন। কেননা প্রথমবার ফোন করে লাইন পাওয়া গেলেও সাথে সাথে

www.nagorikpathagar.org

আবারো ফোন করে আর লাইন পাওয়া যেত না। শুধু এনগেজড্ টোন আসত। এদিকে মেলা একদম কাছাকাছি চলে এসেছে। আমিও অন্য প্রকাশনা নিয়ে প্রচণ্ড ব্যস্ত। এভাবেই ১৯৯৬ সালের বইমেলায় **মানুষ মানুষ খেলা** আর প্রকাশিত হয়নি। এরপর কিছুদিন অভিমান করে বসে থাকার পর আবারো যোগাযোগ শুরু করলাম– এবার টার্গেট ১৯৯৭-র বইমেলা।

অনেক কথা বলার পর মাহমুদুল হক জানালেন– পাণ্ডুলিপি, প্রুফ এবং কভার ডিজাইন তিনি একসাথে কোথাও রেখেছিলেন– সেগুলো আর পাওয়া যাচ্ছে না। প্রচণ্ড মন খারাপ হয়ে গেলো। পরে তিনি নিজেই আবার প্রস্তাব দিলেন কম্পিউটার থেকে আরেকবার প্রিন্ট দেয়ার জন্য এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বইটি তিনি চূড়ান্ত করে দেবেন। নতুন করে কভার করার কথাও বললেন। এবার কভার করলেন ধ্রুব এষ। এবারের কভারটিও তার খুব পছন্দ হলো।

মাহমুদুল হকের কথামতো আবারো প্রিন্ট দেয়া হলো প্রুফ দেখার জন্য। নির্দিষ্ট সময়ে প্রুফের খোঁজ নিতেই আরো কিছুদিন সময় চাইলেন। এভাবে কয়েকবার সময় বাড়ানোর পর একদিন বাসায় হাজির হলাম, দেখা হলো প্রথমে মামীর সাথে। তিনিই জানালেন আমি যে প্রুফ দিয়েছিলাম সেগুলো উলুতে খেয়ে ফেলেছে। আমি কিছুক্ষণ বসে থেকে মাহমুদুল হকের সাথে দেখা না করেই চলে এসেছিলাম, গেট দিয়ে বের হওয়ার সময় কানে আসলো মামী স্বগতোক্তির মতো আস্তে আস্তে বলছেন– ছেলেটা কি বোকা নাকি, ও কি বুঝে না যে তাকে দিয়ে বই-টই আর হবে না। এরপর আর কোনোদিন আমি এই বই-এর ব্যাপারে তাঁর সাথে কোনো যোগাযোগ করিনি। তবে মৃত্যুর বছরখানেক আগে দু-তিনজন যাদের সাথে মাহমুদুল হকের যোগাযোগ ছিল তারা আমাকে জানিয়েছিলেন বইটির ব্যাপারে তাঁর আগ্রহের কথা। কোনো এক দৈনিকের সাক্ষাৎকারেও নাকি এ প্রসঙ্গ তিনি টেনেছেন। নানান কারণে আমার পক্ষে আর মাহমুদুল হকের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়ে উঠেনি।

পাঠক কম্পিউটারে থাকা সেই গল্পগুলোই এই বইয়ে স্থান পেল যেগুলো তিনি **মানুষ মানুষ খেলা**র জন্য নির্বাচন করেছিলেন। স্বত্ব এবং উৎসর্গ মাহমুদুল হক যেভাবে ঠিক করে দিয়েছিলেন সেভাবেই রাখা হলো। ভুল-ত্রুটির দায়ভার প্রকাশকেরই থাকলো। বর্তমান প্রচ্ছদটি ধ্রুব এষ আবার করে দিয়েছেন। তার করা আগের সুন্দর প্রচ্ছদটিও হারিয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ এটি এই বইয়ের তিন নম্বর প্রচ্ছদ।

রত্ন বিশেষজ্ঞ মাহমুদুল হক আমাকে যে প্রেসক্রিপশন দিয়েছিলেন কত রতির ইয়েলো শেফায়ার দিয়ে আংটি বানিয়ে পড়ার জন্য– যাতে আমার দুর্দশা লাঘব হবে– ১৯৯৮ সালে কলকাতায় গিয়ে এক দোকানে ইয়েলো শেফায়ার পাথর দেখে বটু মামার প্রেসক্রিপশনটা মানিব্যাগের পকেট থেকে বের করেছিলাম। ঐ ওজনের দাম সাড়ে চার না পাঁচ হাজার টাকা চেয়েছিল। আমার পক্ষে ইয়েলো শেফায়ার

www.nagorikpathagar.org

কেনা সম্ভব হয়নি। বটু মামা বলে দিয়েছিলেন ঢাকা থেকে যেন না কিনি এবং কেনার পরে অবশ্যই তাকে যেন দেখাই। বুঝতে পারিনি। তার মৃত্যুর পর পত্রপত্রিকায় ও নানাজনের মুখে মাহমুদুল হকের রত্ন বিশেষজ্ঞ পরিচয় জেনে এখন তার লেখা সেই টুকরো কাগজের প্রেসক্রিপশনটা খুঁজে বেড়াই কয় রতি ইয়েলো শেফায়ার লিখেছিলেন সেটা জানার জন্য। এখনো পাইনি।

লুৎফর রহমান চৌধুরী

www.nagorikpathagar.org

সূচিক্রম

পালক # ১৩
ল্যুগার ও বেলুন # ২৪
রিজিয়ার পাপ # ৩২
দম্পতি # ৪৫
বেওয়ারিশ লাশ # ৫৩
হঠাৎ জ্যোৎস্নায় # ৫৯
মনসা মাগো # ৭৩
পরী ও বাবরালি # ৮৭
গরু ছাগলের গল্প # ৯৫
চাঁদের হিমে ঝড়বৃষ্টি # ১০৬

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

পালক

এই প্রথম ওদের দু'জনের মুখে ছায়া পড়েছে দুশ্চিন্তার। পুরো আধঘণ্টা যাবৎ ওরা বসে আছে, কিন্তু কারো মুখে কোনো কথা নেই। কথা পাড়তে হলে দু'জনের একজনকেই তার উদ্যোগ নিতে হবে, কেউ-ই তা পারছে না, উভয়েই নীরব; সমস্ত ব্যাপারটাকে এই নীরবতা আরো দুর্ভার করে তুলেছে।

শীতকালের দুপুর এমনিতেই ভালো লাগে মামুনের, কেমন যেন থির, নিস্তরঙ্গ। কোনো হুটোপুটি নেই, প্রবল উল্লাস নেই, সর্বক্ষণ কেউ যেন ছলছলে চোখে গাছপালার দিকে বিভোর হয়ে তাকিয়ে থাকে। এ ছাড়াও সঙ্গে লুলু আছে। সবকিছু মিলে একটা রোমাঞ্চকর অনুভূতির বিষয়। কিন্তু ঘ্রাণ নিতে কষ্ট হচ্ছে, বড় বেশি ধুলোবালি, ফুঁ দিয়ে ধুলো উড়িয়ে তবে যদি সবুজ দেখা যায়, ঘ্রাণ পাওয়া যায়; মোটকথা কেউ-ই সহজ হতে পারছে না।

ওরা বসেছিলো সেগুন গাছের ঝাঁঝরিকাটা ছায়ায়। রাস্তার প্রায় গায়ে পার্কের এই অঞ্চলটি। এখানকার গাছ-গাছড়ার প্রতিটি ডালপালা তার অনেকদিন আগেই মুখস্থ হয়ে গিয়েছিলো। গাছের উদ্দেশ্যে অনেক দিন অনেক কথাই সে মনে মনে বলেছে, প্রতিনিয়তই গাছের পাতা থেকে নীরবতার গায়ে নিঃশব্দে সুখ ঝরে পড়েছে, কতো নিরাপদ পাতার আড়ালে পাখিরা। কী মনে করে সে আওড়ালো, 'এই যে নির্বিকার রৌদ্রের ঝিলিমিলি তোমার হরিৎ পত্রগুচ্ছে, হে বৃক্ষ আমাকে তাহা মুগ্ধ করিয়াছে, হে বৃক্ষ হে দ্বিপ্রহর হে নিরবধি সময়, আমি তোমাদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞ– ' মনে মনে এইসব বললে মামুন। বললে, 'এ জগৎ বড়ই মায়ময়; বাঁচিয়া থাকিতে সাধ হয়, আহা কি অপরূপ, ইহার কী শেষ নাই?'

শেষ হয়তো আছে, কিন্তু এখন অতোসব জটিলতার অন্ধকারে যেতে চায় না মামুন। তাকে রোগের জড় মারতে হবে। দুরস্ত করে আনতে হবে বিশেষ একটি সমস্যাকে।

অনেক পরে কাঁচুমাচু মুখে সে কিছু একটা বলার চেষ্টা করে, বুঝতে না পেরে লুলু 'লুলু আমি ঠিক– '

www.nagorikpathagar.org

লুলু ওর দিকে ঘাড় ঘোরায়, মামুনও অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কোনোমতেই সে তার কথা তুলতে পারে না।

শীতকালের দুপুরে এইরকমই হয়, নরোম রৌদ্রের গায়ে মেদুর পুলক ঝালরের মতো ঝুলতে থাকে। মনে হয় এক চিলতে মনোরম সিলক; তার গায়ে গাছ-গাছালির ছায়া নকশা বুনে রাখে, কোনো কাঁপন নেই, সামান্য একটা ছোঁয়া পেলেই ঝরঝর করে ঝরে পড়বে। মামুনের সব অনুভূতি আলোর মতো থির হয়ে থাকে। তুলো ওড়ার মতো কিছু কিছু ওজনহীন ভাবনা নিজের গরজেই তার অন্তরে ওঠানামা করে।

শীতকালের দুপুরের ওপর যতো দুর্বলতাই থাকুক না কেন, আসল কথা এই মুহূর্তে থৈ পাচ্ছে না মামুন, সরাসরি সে বিশেষ একটি আলোচনায় জড়িয়ে পড়তে চায়, অথচ এই ধরনের ব্যাপারে তাকে স্বভাবের বিরুদ্ধে যেতে হবে বলে ভয়-ও একেবারে কম নেই। বুঝতে পারে তার ভেতরে চলছে একটা অতি পুরোনো পাম্প মেসিন, আল বাঁধা জমাজমিতে তুমুল রক্তস্রোত বয়ে চলেছে। লুলুই সূত্রটা তোলে শেষ পর্যন্ত। বললে,'থামলে কেন, বলো।'

'আমি কতোগুলো কথা বলতে চাই– '

'আমি তো শুনছি-ই, বলো।'

মানে, ঠিক তুমি কীভাবে নেবে– '

লুলু স্থিরদৃষ্টিতে মামুনের দিকে তকালো। তার চাহনিতে এ কথাই ছিলো, কী বলতে চাও তুমি, অর্থাৎ ব্যাপার কি!

মামুন খুব অসহায়ের মতো বললে, 'তুমি যে কী ভাববে। আমি ঠিক তুলতে চাইনি এসব, কিন্তু– '

লুলু ঝট করে বললে, 'ভণ্ডামি কোরো না– '

আবার পিছিয়ে গেল মামুন।

লুলুর চাহনি কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে আসে এই সময়। মুখ কালো করে সে বললে, 'তুমি কিছু একটা সন্দেহ করছো আমার ব্যাপারে, এই তো

'আমি তা চাইনি, তবে– '

'তবে কি?'

'তোমাকে নিয়ে খুব কানাকানি হচ্ছে, এসব আমার ভালো লাগে না শুনতে– '

'কানাকানি করছে কারা?'

'মনে করো আমাদের দু'জনকেই চেনে এমন লোকজনেরা'

'তা কী ধরনের কানাকানি জানতে পারি কি?'

'এই তোমার চালচলন, ধরো এইসব নিয়েই– '

'অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে আজেবাজে কথা বলে তোমার সম্পর্কে, আমি সেই কথাই বলতে চাচ্ছিলাম তোমাকে– '

'বলে, আর খুব মনোযোগ দিয়ে তুমি তাই শোনো, এই তো?' মুখের কথা কেড়ে নিয়ে, খুব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করে লুলু।

www.nagorikpathagar.org

'ঠিক শুনি না, শুনতে হয়– '

'তোমার রুচিতে বাধে না?'

'বাধে বলতে পারো। যারা শোনায় তারা হিতাকাঙ্ক্ষী সেজে জোর করেই শোনায়।'

'জোর করে কেন, কেনই বা শুনতে চাও না তুমি?'

'শুনতে আমি কষ্ট পাই– '

'তা পেতে পারো, কিন্তু নিয়মিত শোনো এবং বিশ্বাস করো, এই তো?'

ঠিক বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়, আসল কথা হর-হামেশাই এইসব আজেবাজে কথা শুনতে হচ্ছে আমাকে, আমার ভালো লাগে না এসব– '

'ভালো লাগার চেষ্টা করলেই হয়'

'তুমি রেগে যাচ্ছ লুলু, আমি কোনোকিছু ভেবে এসব বলিনি।'

'চেপে ধরে রাখতে পারো না তাদের মুখ? যারা আজেবাজে কথা রটায় তাদের আস্কারা দাও কেন?'

'এমন লোকও তো থাকতে পারে, যার কথা শুনতে হয়?'

লুলু চোখ নাচিয়ে একটা কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে গা ছেড়ে দেবার ভঙ্গি করে। বললে, 'তা হলে দেখা যাচ্ছে সত্যিই আমার চরিত্তির খারাপ। আহা, বেচারা মামুন, কি গাড্ডাতেই না তুমি পড়েছ। এ অবস্থায় তোমার জন্যে আপসোস না করলে সত্যিই অধর্মের কাজ হবে!'

লুলুর মূর্তি দেখে ঘাবড়ে যায় মামুন। সে মনে মনে বললে, 'হে সময়, হে শীতকালের দুপুর, তুমি আমার গলায় ফাঁস দিও না–;

একটু পরে চাপাস্বরে আহতের মতো সে বললে, 'লুলু তুমি এভাবে কথা বলছো কেন, আমি তোমাকে কোনোরকম অপমান করতে চাইনি, তোমার বিশ্বাস করা উচিত!'

'না অপমান করার কোনো দরকারই তোমার নেই, সে আমি আগেই বুঝেছি। তুমি আগেভাবেই বিশ্বাস করে বসে আছো আমার চরিত্র খারাপ। ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে। চরিত্রের একটা ডেফিনেশন দিতে পারো?'

মামুন বললে, 'তর্ক বাড়িয়ো না, আমি আর শুনতে চাই না। তুমি রেগে গেছ, অযথা দোষারোপ করছো আমাকে– '

'আহা বলোই না, আমি সত্যি-সত্যিই জানতে চাই চরিত্র কাকে বলে।'

'আমার জানা নেই– '

'না জানারই কথা। আর সকলের মতো ভণ্ডামিকে যদি চরিত্র বলে মনে করো, তাহলে ঠিকই আমাকে চরিত্রহীনতার অপরাধে অপরাধী করতে হবে তোমার!' একটু থেমে লুলু আবার বললে, 'অতো রাখাঢাকার কি আছে, পষ্টাপষ্টিই কথা বলা ভালো। ঢাক ঢাক গুড় গুড় করে কথা বলা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। তুমি না মাঝে মাঝে ব্রথেলে যেতে? যেতে তো? হ্যাঁ, রেগুলারই যেতে, তোমার নিজের মুখ থেকেই তো

www.nagorikpathagar.org

শোনা আমার। তখন তোমার নিজের চরিত্র সম্পর্কে কোনো সংশয় দেখা দেয়নি যে! উত্তর দেবার চেষ্টা কোরো না কেননা এর কোনো সদুত্তর তুমি দিতে পারবে না, বরং দশটা মিথ্যে তৈরি করতে গিয়ে নিজের জালেই আটকা পড়ে যাবে। কিন্তু এ প্রশ্ন আমাকে যদি কেউ করতো, মানে তোমার বেলায় আমি হলে এই কথাই বলতাম– না, চরিত্র সম্পর্কে কোনো সংশয়ই দেখা দেয়নি, আমার প্রয়োজন ছিলো আমি গিয়েছি, সোজা কথা, মানুষ তো প্রয়োজনেরই ক্রীতদাস। আমি জানি এটাই একমাত্র সত্যি। যে যেভাবে পারছে তার প্রয়োজনকে মেটাচ্ছে, মেটাতে হচ্ছে, কেননা প্রয়োজন কোনো না কোনোভাবে মেটাতে হয়। অক্ষমরাই শুধু নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে অপারগ, তারা আজীবন অন্যের মুখ চেয়ে হাপিত্যেস করে যাবে। জীবনভর পদদলিত হওয়াই এদের ললাট-লিখন। দু-চারজন অবশ্য নাকের জলে চোখের জলে এক হয়ে নাকি সুরে কাঁদুনি গেয়ে নিছক মানবজন্মের উদ্ধার করে বেড়ায়।'

এ পর্যন্ত এসে কিছুক্ষণ থেমে শাড়ির পাড় দিয়ে খুব যত্ন করে পায়ের পাতা ঢেকে দিল লুলু। একটু দম নিয়ে সে বললে, 'তোমার নিজের কথাই ধরো। আমার সঙ্গে পরিচয়ের পর একদিন দুর্বল মুহূর্তে নিছক আবেগের বশে এ তথ্যটি ফাঁস করে ফেললে তুমি, সত্যি বলছি, তখন তোমার বৈজু বৈজু ভাব দেখে গা জ্বলে যাচ্ছিলো আমার, ন্যাকা প্রেমিকের মতো হাউকাউ শুরু করে দিয়েছিলে তুমি। পরে হুঁশ হলো, এসব ঠিক হচ্ছে না, অমনি ভূরি ভূরি তুফান ছোটাতে শুরু করলে মিথ্যের। আমি আর কি করবো, মনে মনে শুধু হাসলাম। তোমার মাথায় চুল বেশি থাকতে পারে, কিন্তু বুদ্ধি খুব বেশি নেই। নিছক কারো ভয়ে কেউ ভালো হয়ে যেতে পারে, কখনো এমন ঘটেছে? একবার একথাও আমার মনে হয়েছিলো, অন্যভাবে তুমি আমাকে বিশেষ একটি দিকে প্ররোচিত করতে চাও। তোমার হয়তো মনে নেই আর এখন, আস্তে করে আমি বুকের আঁচল কোলে ফেলে দিয়েছিলাম। তুমি গুডবয়ের মতো একটা পাতাকুড়ুনি ছুঁড়ির দিকে চোখ ফিরিয়ে দাঁত দিয়ে ঠোঁটের চাল কাটতে শুরু করে দিয়েছিলে।'

বাধা দিয়ে মামুন বললে, 'লুলু এসব কী বলছো তুমি, আমি তোমাকে যে কথা বলতে চেয়েছিলাম– '

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে লুলু বললে, 'সেই কথাতেই তো আসছি। অধৈর্য হচ্ছো কেন! সেদিনই বুঝলাম আবেগ ছাড়া আর কিছুই নেই তোমার। আমার সম্পর্কে কী কী শুনতে পারো আমার তা মোটামুটি জানা আছে কিছুই যায়-আসে না তাতে আমার। এমনটি হোক, মনে মনে চেয়েওছিলাম তাই, যদি তোমার হুঁশজ্ঞান জন্মায়। যদি চোখের পর্দা সরে যায়। তুমি মুখে ভালো হবার দোহাই দিয়ে যতো আশ্বাসের কথাই কপচে থাকো না কেন, প্রয়োজন তোমার হবেই, ব্রথেলে যাবার প্রয়োজন হলে যেতে তোমাকে হবেই। নাকি মিথ্যে বলছি? সব ব্যাপারটা তো মোটামুটি প্রয়োজনকে কেন্দ্র করেই এখন যদি বলি এমন প্রয়োজন আমারই বা থাকবে না

www.nagorikpathagar.org

কেন, তাহলে কী উত্তর দেবে? প্রয়োজনের সময় কী-একম সুবিধের দরোজা আমার জন্যে খোলা আছে বলে দাও দিকি'

মামুন ঘড়ঘড় করে বললে, 'তুমি অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়েছ লুলু, এবার থামো, দোহাই তোমার, তুমি জোর করে ক্ষুরঅলা আধুনিকা হতে চাচ্ছ, আমি এসব বুঝি–' 'তুমি ছাই বোঝো। যে-ই আমি আমার প্রয়োজনের কথা পাড়লাম অমনি কথাটাকে অন্যখাতে বইয়ে দেবার চেষ্টা করলে। তুমি ভাবছ নিছক তর্কের খাতিরে আমি এভাবে জামা কাপড় খুলে উদোম হচ্ছি! তর্ক-ফর্ক বুঝি না, আমারই বা প্রয়োজন থাকবে না কেন? শরীর ও মনের, খুড়ি দেহ ও মনের দিক থেকে কি আমি সম্পূর্ণ সুস্থ নই? শরীর বললে হয়তো কেঁপে যেতে পারো, তোমাদের তো আবার নানা রকমের বাতিক থাকে। বলো, এমন প্রয়োজন দেখা দিলে আমার কোনো ট্যাবলেট খাওয়া উচিত? শুধু এই জন্যেই আমি আমার বড়পার বাড়িতে এখন আর ভুলেও কখনো রাত কাটাই না। ওরা স্বামী-স্ত্রী রাত্রিবেলা যখন চোখের সামনে দরোজা বন্ধ করে দেয় তখন সেটাকে আমার ঠাট্টার মতো মনে হয়, মনে হয় দরোজা বন্ধ করার ঠিক আগের মুহূর্তে ওরা আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসেছিলো, আমি দেখতে পাইনি। কিছুতেই ঘুম আসে না আমার চোখে, অথচ নিজেদের বাড়িতে কখনো এ রকম হয়নি।'

মামুন বললে, 'কোনো মাথমুণ্ডু নেই তোমার কথার– '

লুলু বললে, 'এখনো ঢোকেনি তাহলে তোমার মাথায়! আচ্ছা ব্রথেলে গিয়ে তুমি কী করো? খুড়ি, কী করতে?'

মামুন কেঁপে ওঠে এ কথায়।

বললে, 'নোংরা কথার উত্তর আমি দেবো না–!'

'আসলে বোঝোনি, আমি কী জানতে চাচ্ছি। আমি বুঝতে পেরেছি তোমার ভিতরে উদ্যোগ বলে কোনো বস্তুর কোনো নামগন্ধই নেই। তৈরি করে দিলে গাবুর গুবুর খেতে পারো! রসগোল্লা তোমার গালের সামনে তুলে ধরলে তবে তুমি তা গিলতে পারো। কেড়ে খাওয়া তো দূরের কথা, নিজের হাতে তুলে খাওয়ার ক্ষমতাও তোমার নেই; এই কারণেই তুমি ব্রথেলে যাও, কোনো উপায় নেই তোমার না গিয়ে! তা না হলে, মনে করে দেখো, কমপক্ষে অন্তত একশো দিন তো হবেই গায়ে-গা লাগিয়ে রাতের অন্ধকারে আমরা একই রিকসায় ফিরেছি, তুমি সর্বক্ষণ নিজের ঢ্যাড়স মার্কা ভালোমানুষি বজায় রেখে কাঠ হয়ে বসে থেকেছ। এও এক জাতের বাহাদুরি, ভালো মানুষির ঢোস্কা বাহাদুরি। কী মানে হয় এসব দেখানোর? ভালোমানুষি-টালোমানুষি এসব বাজে কথা, তুমি ইনিসিয়েটিভ নিতে জানো না, সে সাহসই নেই তোমার। যদি আমি তোমার একটা হাত ধরে বুকের উপর টেনে নিতাম, তিন সেকেণ্ডও দেরি হতো না তোমার ঝাঁপ দিয়ে পড়তে! এই জাতের পুরুষ জীবনে অন্যকে দুঃখ দারিদ্র্য ছাড়া আর কিছু দিতে পারে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। অথচ জানো, প্রথম আলাপের দিনই আমার হাত ধরেছিলো মুসাদ্দেক, তিন দিনের দিন জোর করে চুমু খেয়েছিলো। আমি রেগে থাপ্পড় মারায় বেহায়ার মতো

www.nagorikpathagar.org

হে হে করে হেসে উড়িয়েই দিয়েছিলো, যেন চুমু খাওয়ার ব্যাপারটা নাক ঝাড়ার চেয়ে অতিরিক্ত কিছু একটা নয়, রাগ পানি হয়ে গিয়েছিল আমার। তাকিয়ে দেখো তুমি মুসাদ্দেকের দিকে, কতো চওড়া ওর বুক, শুধু দুঃসাহসকে মূলধন করে কাজের ধান্ধায় দুমদাম চরকিবাজির মতো ঘুরছে। দু-দুটো অফিস চালাচ্ছে একা। আমি জানি জীবনে অনেক উন্নতি করবে মুসাদ্দেক, ওর কোনো ঠুনকো লাজ-লজ্জার সমস্যা নেই, ভণ্ডামি নেই, ও ইনিসিয়েটিভ নিতে জানে। যদি ওর সঙ্গে চিরকালের জন্যে গলার তক্তি হয়ে ঝুলি আমার কোনো ভয় থাকবে না। ও আমাকে খাওয়াতে-পরাতে পারবে, রাণীর হালে থাকতে পারবো আমি ঠ্যাং-এর উপরে ঠ্যাং দিয়ে– '

মামুন হেসে ফেললো। বললে, 'বুঝেছি বুঝেছি, তুমি আমাকে চটাতে চাচ্ছ, আমি কিন্তু চটবো না, কিছুতেই না– '

লুলু খিলখিল করে হেসে লুটিয়ে পড়লো ঘাসের ওপর।

আঁচল ঠিক করে বললে, 'বাহাদুর বটে। অমন হাঁসফাস করছো কেন?'

মামুন বুকে হাত দিয়ে বললে, 'বড় ব্যথা।'

'তবু ভালো, ঠাট্টাচ্ছলে সত্যি কথাটা বলতে পেরেছো।'

একটু ভেবে মামুন বললে, 'লুলু, এক সময় মুসাদ্দেককে তুমি ঘৃণা করতে– '

'ঠিক ঘৃণা করতাম কিনা বলতে পারবো না, মেয়েরা হয়তো সত্যিকার অর্থে স্বজাতের বাইরে কাউকেই ঘৃণা করে না। তবে হ্যাঁ, পছন্দ করতাম না ঠিকই। মুসাদ্দেক এক সময় দু'চোখের বিষ ছিল আমার। দেখলেই পেছন থেকে ফুট কাটতো– লুলুপাখি লুলুপাখি কোথা যাও নাচি নাচি, দাঁড়াও না একবার ভাই– '

'হ্যাঁ একবার তুমি মুখ ঝামটে উত্তর-ও দিয়েছিলে– '

'মনে পড়েছে তাহলে! কী উত্তর দিয়েছিলাম? ওই ফুল ফোটে বনে, যাই মধু আহরণে, দাঁড়াইবার সময় তো নাই। আর ওই উত্তর দেয়াটাই হলো আমার কাল, নচ্ছারটা ভাবলো আমি ওর লাইনে এসে গেছি। ব্যস, আর যায় কোথায়, দিনরাত পেছনে লেগে রইলো কুকুরের মতো। একদিন একা একা রাস্তা পার হচ্ছি, দিলো গায়ের ওপর গাড়ি চালিয়ে, আর একটু হলেই চাকার তলায় পড়ে যেতাম। গলা বাড়িয়ে বেহায়ার মতো বললে, এরপরও যদি সাড়া না দাও খোদার কসম বলছি থেঁতলে কিমা বানিয়ে তবে ছাড়বো। বেহায়া কী আর গাছ থেকে পড়ে বলো, এমন ডাকাতকে কীভাবে আমি ঠেকাই!'

মামুন অসহায়ের মতো বললো, 'সত্যিই কি তুমি কোনোদিন আমাকে বিশ্বাস করতে পারোনি লুলু?'

লুলু বললে, 'তোমাকে নিয়ে এক বিপদই হয়েছে আমার। তুমি সেই বৃটিশ আমলের মানসিকতা এখনো মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারোনি। এখন থেকে সাবধান হয়ে যাও। এটাকে একটা শিক্ষা হিসেবে নাও, বেঁচে যাবে। কুমারী মেয়েদের অনেক ল্যাঠা। তাদের সঙ্গে থাকলে গা রি রি করে জ্বলতে থাকে আমার। নাড়ুগোপালের মতো চেহারা করে সব সময় এই কথাই ভাবো, কেন– প্রেম ছাড়া

www.nagorikpathagar.org

মেয়েদের আর কিছু করণীয় নেই! আমার কথাই ধরো, প্রেমট্রেম আমার মগজে কিছুতেই ঢোকে না। এতোটুকু বুঝি, মানে বুঝতে হয়, হেডক্লার্ক আবার কাঁধে আদর্শ আড়াইমুনে ধামা হয়ে আর বেশিদিন চেপে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। নইলে বেচারাকে ছানাপোনা গাড়ু বদনা ফেলে পোঁ পোঁ করে হেমায়েতপুরের দিকে ছুটতে হবে। আমাকেই আমার জুটির মোরগের ঝুঁটি ধরতে হবে। প্রেমে-ফ্রেম নিয়ে লুকোচুরি খেলার এটা কি কোনো সময়! রাজি থাকো তো বলো, আলাপ করিয়ে দিই আমার বড়পার সঙ্গে। সে বেচারি এক ধোয়াঘাটের মূলোমার্কা পোস্টমাস্টার স্বামীরত্ন আর তিন-তিনটে ন্যাণ্ডাগ্যাণ্ডা নিয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, এখন সে প্রেম করতে চায়। এখন তার পানজর্দার মতো একটু একটু আয়েশী স্বভাব দেখা দিচ্ছে, বুঝলে তো, ভাবাবেগ নিয়ে একটু বিলাসিতা করতে চায়, জীবনটা তার চূড়ান্ত একঘেয়েমির গাড্ডাতে পড়ে একেবারে ফিকে পানসে হয়ে এসেছে। আমার কথা আলাদা। আমার তো আর বড়পার মতো পোস্টমাস্টার নামের কোনো জবরদস্থ খুঁটি নেই। যোগাড়-জন্তর নিজেকেই আমার করতে হবে'

মামুন মনমরা হয়ে বললে, 'কোনোদিনই কোনো আভাস দাওনি তুমি, আমি এতোসব আন্দাজ করিনি লুলু, ভেবেছিলাম তুমি হয়তো চাও আমাদের সম্পর্ক আরো গভীর হোক, এইখানেই আমার ভুল হয়ে গেছে। তা না হলে ঠিক এভাবে তুমি অপমান করতে পারতে না!

'অমন ছলছলে কথা বলো না, এগুলো কি অপমানের কথা? তোমার দরকার একটি ছোট্ট নরোম টুনটুনির। তুমি ঝুমঝুমি কিনে দেবে, সে টুনুর টুনুর করে বাজাবে। টু-কি টু-কি খেলতে খেলতে হঠাৎ গাছের আড়াল থেকে তুমি বলে উঠবে হেউ, সে বলবে ওমা আমার ভীষণ ভয় করে। এইভাবে দিনের পর দিন শুধু আকাশ দেখে পকেটে চিনেবাদাম বোঝাই করে আনমনে ঘাস চিবিয়ে দিন কেটে যাবে তোমার– ' মামুন অসহিষ্ণু হয়ে বললে, 'কিন্তু এতোদিন তো তোমার কোনো তাড়া দেখিনি। কোনো সুযোগ দিয়েছো তুমি আমাকে কথা পাড়বার, তোমার মনের কথা কী করে বুঝবো বলো?'

'সুযোগ করে নিতে হয়– '

'লুলু আজ তুমি পড়া মুখস্থ করে এসেছো– '

'তোমাকে বিয়ে করলে জীবনভর নাংলা চাষার গরুর মতো স্রেফ ঠেলে ঠেলে চালাতে হবে, গুতো মেরে ক্ষেত চষাতে হবে, রক্ষে করো! নিজের ওপর অতোখানি বিশ্বাস নেই বাপু। তোমার ধাপ আমি অনেক আগেই বুঝে গেছি, তা না হলে মুসাদ্দেককে অতো সহজে আমি কথা দিতাম না, কিছুতেই না।

মামুন ভিতরের ঝড় গোপন করে শান্ত গলায় বললে, 'সত্যি বলছো লুলু, কথা দিয়েছো? সত্যি?'

'সত্যিই আমি হাঁপিয়ে পড়েছি মামুন, তুমি বিশ্বাস করো, আমি হাঁপিয়ে পড়েছি। সেই একই রাস্তায় রিকশায় করে ফেরা, সেই একই গাছের তলায় পা মুড়ে বসে

www.nagorikpathagar.org

ফিসফিস করে নরোম নরোম কথা বলা, দিনের পর দিন সেই একই গাছ ফুল আর পাখির প্রশংসা শুনতে শুনতে কানমাথা ঝালাপালা হয়ে গেছে আমার, এখন সত্যি এসবে আমার গা গোলায়। কিছু মনে কোরো না মামুন, তুমি নিজেই চিন্তা করে দেখো এসব সত্যি কিনা। এই এক বছর তুমি শুধু আমাকে ফুরফুরে হাওয়া খাইয়েছ, শুধু আকাশের কথা বলেছ, গাছপালা আর পাখির কথা বলেছ, বড় বড় লেখকদের নিয়ে খামোখা ভ্যারেণ্ডা ভেজেছ, তোমার চক্কোরে পড়ে সত্যিই আমি দারুণ হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। মেয়েদের এভাবে ভেসে বেড়ানো চলে না: ভাসার একটা সীমা আছে, আমি সীমার বাইরে চলে যাচ্ছিলাম। আসলে ঝুঁকি ধরা- থুড়ি, নীড় বাঁধার জন্যেই যে এতোসব মাথামাখি একথাটি একটিবারও তোমার উর্বর মস্তিষ্কে এতোদিন খেলেনি'

এতোক্ষণে ভীষণ উত্তেজিত মনে হলো মামুনকে। সে ফস্ করে একটা সিগ্রেট ধরায়, কয়েকটি টান মেরেই ফেলে দেয়।

বললে, 'বেশ আমি রাজি আছি। বলো কবে বিয়ে করতে হবে?'

এ কথায় খিল খিল করে হেসে ঘাসের উপর লুটিয়ে পড়ে লুলু। বললে, 'আমি জানতাম, আজ- '

'বলো তুমি রাজি কিনা- '

'তোমার যোগ্যতাটা কী শুনি?'

'এটা কোনো প্রশ্নই নয়! সব জেনেশুনেই তুমি মিশেছিলে- '

'তা ঠিক! প্রথম পরিচয়ের সময়ে ব্যাংকের সামান্য একজন জুনিয়ার অফিসারকে একেবারে তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিতে পারিনি! অবশ্য কখনো আকাশের চাঁদও মনে করিনি। তাছাড়া মুসাদ্দেককে তখন চিনতাম না। বলতে পারো তোমার সঙ্গে তুলনা করেই কতকটা বেছে নিতে হয়েছে আমার মুসাদ্দেককে, অন্তত তোমার কাছে সত্যিই আমি কৃতজ্ঞ। আমি চিরকাল তোমাকে উপকারী বন্ধু হিসেবে মনে রাখতে চেষ্টা করবো-'

মামুন বললে, 'লুলু হৃদয় বলে তোমার কোনো কিছুই নেই। তুমি জীবনে কোনোদিন কারো কাছেই বোধ হয় সুখী হতে পারবে না।'

'অভিশাপ দিচ্ছো?'

'অভিশাপ নয়, লুলু, এই রকমই হয়। জীবনের কাছে যারা খুব বেশি দাবি করে, যারা কোনোদিন জীবনের সামনে নত হতে শেখেনি, তাদের এই রকমই হয়। জীবনের প্রতিটি ধাপ তারা একটার পর একটা শুধু ভেঙে চলে। অন্তরের ক্ষোভ আর লোভকে খানিকটা দমন করা উচিত। নিজেকে শান্ত করা চাই, কোনো সময়ই তুমি সবটুকু পাবে না, কিছুটা থেকে যাবেই; তুমি তো একটা মানুষই, কতোদূর আর ছুটতে পারবে তুমি! আমি যা বলতে চাই তুমি নিশ্চয়ই তা বুঝতে পারছো। লুলু এই যে মোহ, এটাও তো এক ধরনের দাসত্ব!'

কিছুটা গম্ভীর মনে হলো লুলুকে। চিন্তাক্লিষ্ট মুখে সে বললে, 'ধার করা কথা শুনিয়ে কোনো লাভ নেই, মামুন, আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি- '

www.nagorikpathagar.org

মামুন ম্লান হেসে বললে, 'তোমার বুঝি তাই মনে হলো, ঠিক আছে, তাহলে চলো, ওঠা যাক– '

লুলু বললে, 'মাঝে মাঝে তোমার অভিনয়টা মোটামুটি উতরে যায়, যেমন এই একটু আগে যে কথাগুলো বললে, মনে হলো যেন অন্তর থেকে বলছো, আর একটু হলেই আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যেত– '

মামুন নির্মম দৃষ্টিতে লুলুর দিকে তাকালো। বললে, 'ধার করা কথা বলিনি লুলু। এতদিন তোমার কাছে আমি গোপন করেছিলাম, এখন বলছি, কেননা এখন তো আর সেরকম কোনো ভয় নেই। লুলু, আমি বিবাহিত, বছর তিনেক আগে আমি বিয়ে করি। তুমি আমার যে চাকরির কথা জানো তা-ও ছিল আমার শ্বশুর-বাহাদুরের দক্ষিণা। আমার স্ত্রী আমারই একজন উঠতি ধনী বন্ধুর সঙ্গে ঘর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলো এক বছরের একটি বাচ্চাকে ফেলে। আমার মনে হয় তোমার মতো উচ্চাশাই তাকে ঘরছাড়া করেছিলো– '

'এসব সত্যি?'

'কী লাভ মিথ্যে বলে। বাচ্চাটি তার নানীদের কাছে আছে।'

কিছু একটা ভাবলো লুলু। তারপর বললে, 'বুঝলাম! কিন্তু তোমার স্ত্রীর এতে অপরাধটা কোথায়? সে যদি তোমার সেই বন্ধুটির কাছে সুখী হয়ে থাকে, সবকিছু মেনে নিতে আপত্তি কোথায়?'

'আমার মেনে নেওয়া না নেওয়ায় কিছু আসে যায় না'– মামুন রুগ্নস্বরে বললে, 'কিন্তু সে সুখী হয়নি– '

'বুঝলে কী করে?'

'রানু, মানে আমার সেই স্ত্রী এখন ফিরে আসতে চায়। দু'বার সে পালিয়ে এসেছিলো, আমি উঠতে দিইনি, দু'বারই বিদায় করে দিয়েছি। এই উড়োঝক্কি কাঁহাতক সামলানো যায়, শেষ পর্যন্ত বাসা বদল করতে হয়েছে আমাকে– '

'বের করে দিলে, কেন আশ্রয় দিলে না?'

'কেন দেব?'

'ফিরে এসেছে বলে– '

'কিন্তু আমার তো কোনো মমত্ববোধ ছিল না ওর ওপর। ওকে আমি ঘৃণাই করি এখন!'

'আশ্চর্য তোমরা!' চোখ লাল করে লুলু বললে, 'আশ্চর্য তোমাদের জাত! ঘৃণায় একেবারে টইটুম্বুর হয়ে আছ, অথচ মুসাদ্দেকের সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা জেনেও বারবার রেডিমেড বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছ এতো লুকোচুরিও তোমরা নিজেদের সঙ্গে খেলতে পারো! ছি! তা কীভাবে বিদায় করলে?'

'সেকথা শুনে কী লাভ তোমার?'

'লোকসানও নেই এমন কিছু–'

www.nagorikpathagar.org

'প্রথম দিন হাত ধরে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিলাম। দ্বিতীয়বার এমন নাছোড়বান্দার মতো ব্যবহার শুরু করে দিলো যে বাধ্য হয়ে মারধোরও করতে হয়েছিলো আমাকে– '

'তা তো করবেই, দ্বিতীয় দিন তোমার মতো পুরুষমানুষের সাহস বেড়ে যাবারই কথা। প্রথম দিন কি সত্যিই হাত ধরে বের করে দিয়েছিলে, না ঘাড় ধরে? পাড়ার লোক ডাকোনি?'

'ডাকতে হয়নি, আপনিই জুটে গিয়েছিলো– '

'স্বামীরত্নটি তুমি বাহাদুরই বটে! এতে কার অসম্মান হলো?'

'তা আমি জানি না– '

'এতোই যদি বাহাদুরি, সেই বন্ধু নামক মহারত্নটিকে দু'ঘা দিয়ে কেদ্দানি দেখাতে পারলে না, মেয়েমানুষের উপর হাতের সাধ মিটিয়ে নিলে!'

মামুন বললে, 'তার কী দোষ! তাকে পেটাবো কেন! তাছাড়া তার সঙ্গে আমি পেরেও উঠতাম না– '

'তবু তো তুমি পুরুষ মানুষ, অন্তত দু'ঘা দেবার একটা চেষ্টাও তোমার করা উচিত ছিলো।'

মামুন হেসে বললে, 'তোমার ব্যাপারে যদি আমি এই মুহূর্তে মুসাদ্দেক-এর সঙ্গে লড়তে যাই, তুমি হাসবে না?'

'বাজে কথা রাখো, যা বললে সব সত্যি? আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না মামুন যে তুমি এতোবড় দক্ষ অভিনেতা! ইশ আর একটু হলেই আমি নিজের পায়ে কুড়ুল মেরে বসতাম! সিরিয়াসলি বলো, সব সত্যি?'

'জিজ্ঞেস করে দেখ মুসাদ্দেককে, ও তো সবই জানে– '

কৌতূহলে চমকে উঠে লুলু বললে, 'রানুকে চিনতো মুসাদ্দেক?'

'না চিনলে আর এতোসব ঘটলো কিভাবে।'

'তুমি ইতর, নীচ, বাটপাড়! ভেবেছ ওর নামের সঙ্গে এইসব মিথ্যে অপবাদ জুড়ে দিতে পারলেই আমাকে টলানো যাবে– '

মামুন সংযম বজায় রেখে বললে, 'তুমি জিজ্ঞেস করে দেখো, জিজ্ঞেস করলেই তো সত্যমিথ্যা জানতে পারবে।

'তা তো করবোই। কিন্তু এর একটা যদি মিথ্যে হয়, মুসাদ্দেক যদি নির্দোষ হয় তুমি কিন্তু আমার হাতে চড় খাবে। আমি রাস্তার ওপর মানুষজনের সামনে পা থেকে চটি খুলে তোমাকে পেটাবো, এমন কঠিন শাস্তি তোমাকে দেবো, যা জীবনে কখনোই তুমি ভুলতে পারবে না– '

মামুনের হাসি পেল একথায়। তার মনে হলো লুলু মরিয়া হয়ে তকে সাক্ষী রেখে যেন মুসাদ্দেককেই তার কৃতকর্মের জন্য অকথ্য গাল দিচ্ছে। ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাসে আর এক দুনিয়ায় হয়তো খড়কুটোর মতোই ভেসে যাচ্ছে লুলু, এখন কিছুক্ষণ ওর যুদ্ধ নিজের সঙ্গে। সবচেয়ে বড় ফের নিজের রক্ত যখন নিজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা

www.nagorikpathagar.org

করে। সবচেয়ে বড় দুঃখ সেই যা মানুষের জীবনকে মাত্র একবারই ভয়াবহরূপে মথিত করে। তার কোনো ভয় নেই, মামুন ভাবলো। একই দুঃখ যখন ফিরে ফিরে আসে তখন তাকে ভিখারি মনে হয়, তাতে আর ধার থাকে না, তার সব প্রচণ্ডতা চিড় খায়। তার আর কী, এখন তার গায়ে আঁচড়ও লাগবে না। সে উঠে দাঁড়ালো। থাবড়া মেরে প্যান্ট থেকে শুকনো ঘাসের কুচি ঝেড়ে ফেললো। বললে, 'লুলু তুমি কিন্তু ভীষণভাবে হাঁপাচ্ছো, কাঁপছো, যেতে পারবে তো? আপত্তি না করলে আরো কিছুক্ষণ হয়তো আমরা বসতে পারি– '

লুলু রুক্ষ মেজাজে বলল, 'ঢের হয়েছে, আর ভণ্ডামি করতে হবে না!'

মামুন বললে, 'মধ্যে থেকে খামোখা এখানে একটা পালক খসিয়ে রেখে গেলে লুলু পাখি– '

'কী বললে?' তেড়ে উঠলো লুলু।

মামুন অতিকষ্টে হেসে বললে, 'এই পালকটি কানে গুঁজে অন্তত কিছুদিন ধেই ধেই করে নেচে বেড়ানো যাবে, যাকগে ভালোই হলো– '

একটা রিকসা ডাক দিলো লুলু, তারপর সোজা গিয়ে উঠলো তাতে, গলা বাড়িয়ে চিৎকার করে বললে, 'তোমার মুখে কুষ্ঠব্যাধি হবে, খসে খসে পড়বে তোমার মুখ– ' মামুন কোনো উত্তর দিলো না, দু'হাতে প্যান্ট কোমরের দিকে তুলতে তুলতে সে ওপরের দিকে তাকালো।

এখন আর দুপুর নেই, অনেক আগেই বিকেল গড়িয়েছে, নিস্প্রভ রৌদ্রের গায়ে হিমের ছোপ ধরেছে। মামুন মনে মনে বললে, 'হে অনন্ত, হে নীলিমা আমি আমৃত্যু তোমাকে দেখিতে চাহি, কতোবারই না তুমি আমার নয়ন জুড়াইয়া দিয়াছ, হে বৃক্ষ, হে অক্সিজেন সিলিণ্ডার, তোমরা যুগ যুগ ধরিয়া বংশানুক্রমে মানবজাতিকে কতোই না ভালোবাসিয়াছ, ইহা তুলনারহিত, হে বৃক্ষ আমি তোমার নিকট সাতিশয় কৃতজ্ঞ, যখন প্রত্যহ তোমার সান্নিধ্যে একা একা আসিয়া দাঁড়াইব, হে বৃক্ষ, ছায়া হইতে এই অধমকে বঞ্চিত করিও না, হে সুশীতল ছায়া, তুমি আমাকে পুত্রজ্ঞানে অঙ্ক শিখাইবে কি, এই যে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হইয়া চলিয়াছে দিবারাত্র ইহার ক্যাপসুল তোমাকে আবিষ্কার করিতেই হইবে, এতো শান্তি তুমি কোথা হইতে পাও হে বৃক্ষ, তুমি কাহারো কর্ণকুহরে অদ্যাবধি হ্রেষাধ্বনি দিয়াছ, এইট ইন্টু এইট- গ্লিগলিস ইহার অর্থ কী, কেনই বা হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ মার্মালেড ও অর্ণল্ড টয়েনবি, হে বৃক্ষ তুমি কি স্কারামোচে দেখিয়েছ, গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দার রচনাবলি অবশ্যই মনুষ্যজাতির কল্যাণের নিমিত্ত রচিত হইয়াছে, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই, হে বৃক্ষ হে ফার্ডিনান্দ ডি লেসেপ্‌স হে ভাস্কো ডি গামা, তুমি মনুষ্যজাতিকে সকল বিষয়েই পারদর্শী করিয়া তুলিয়াছ ঠিকই কিন্তু নত হইবার শিক্ষা দাও নাই, আমি নত হইতে চাহি, হে বৃক্ষ আমাকে নত হইতে দাও, মনুষ্যজাতির মেরুদণ্ড কোনোদিন কি সেতারের মতো আহির ভৈরো রাগে বাজিয়া উঠিবে না– '

www.nagorikpathagar.org

ল্যুগার ও বেলুন

২রা অক্টোবর, অপারেশন জু. দোঃ জুদোঃ

আমার কবজির অটোম্যাটিক শেকোয় কাঁটায় কাঁটায় তখন বিকেল চারটে। গতকালকের দিনটা ছিলো বিচ্ছিরি রকমের রেনি। আজকের দিনটা বেশ ঝকঝকে। রূপোর টাকার মতো উজ্জ্বল রৌদ্র, রৌদ্রের চোখেমুখে বেশ হাসিখুশিভাব; শিশিরভেজা ফুলকপির ভিতর সাধারণত এই ধরনের হাসি হাসি ভাব লক্ষ্য করা যায়। কাঁটায় কাঁটায় ঠিক চারটেয় বঙ্গমিতা সু-স্টোরে ইন করলাম আমি, পকেটে ল্যুগার, হিটলারের যা ছিলো; হিটলারের অবশ্য ওয়ালথার পিপিকে-ও ছিলো। দেরি না করে আমার পিছনে পিছনে ঢুকলে টাইফুন। স্টোরে ইন করেই কুইক সব কিছু অ্যাসেস করে ফেললাম। বল্টু, ডিনামাইট আর সুজুকি প্ল্যান মতোই আগে থেকে কাস্টমার সেজে জুতো দেখছে, দিব্যি বিজি রেখেছে তারা সেল্‌সম্যানদের। তিনজন সেল্‌সম্যান, তিনজনেই ভীষণ বিজি। ফাইন! এই তো চাই ইলেকট্রিক অর্থাৎ আমরা যে যার পজিশন ঠিক করে ফেলেছি এরই মধ্যে; টাইফুনের পজিশন দোরগোড়ায়, আমার ক্যাশ কাউন্টারে। ল্যুগার বের করে আমি গর্জে উঠলাম, হ্যাণ্ডস্ আপ্ যে যেখানে যেভাবে আছো হাত তোলো! ইতিমধ্যে স্টেইন বের করে ফেলেছে টাইফুন। সকলের চক্ষু ছানাবড়া! গর্জন করে বললাম, কোনো ভামকিবাজি না করে ক্যাশে যা আছে বের করো, মাত্র এক মিনিট সময়, কুইক-কুইক ডেস্কে বসা ক্যাশিয়ার-কাম-ম্যানেজার লোকটি একটি এনোফিলিস বিশেষ, তবু চোট আছে তার! একেবারে ঝুনো উল্লুক, রামপাঁঠা। বললে, চাকরি যাবে আমার, প্রাণ থাকতে কিছুতেই ক্যাশ দেবো না, যা ইচ্ছে করুন, মেরে ফেলুন! আস্ত উল্লুক একটা! গেলেই হলো চাকরি! চাকরি যাবে আর ইউনিয়ন বসে বসে স্রেফ ধুদুল চষবে, এটা কোনো কথা। কেউ এভাবে ক্যাশ পাহারা দেয়, যাকে বলে নিছক মড়া পাহারা দেওয়া; মড়াটাকে আমাদের হাতে তুলে দিলেই সব ল্যাঠা চুকে

www.nagorikpathagar.org

যায়। ডোন্ট শাউট,-টাইফুন গর্জে উঠলো, কুইক কুইক, ঝটপট, ড্রাকুলা তুই দশ কাউন্ট করে যা, নয় পার হলেই আমি ব্রাশ ফায়ার স্টার্ট করবো, হ্যারিয়াপ্ ম্যান, হ্যারিয়াপ্! সমানে গুনেই মরবে তবু মাল ছাড়বে না। এক ঝটকায় উঠে দাঁড়িয়ে অনুনয়ে ভেঙে পড়লো সুজুকি, প্লীজ ক্যাশিয়ার সাহেব, যা চাচ্ছে দিয়ে দিন, এরা সব পারে, এরা ড্যাকোয়েট–! ক্যাশিয়ার-কাম-ম্যানেজার অর্থাৎ পর্বত প্রমাণ যার গোঁয়ার্তুমি, মাথা নেড়ে বললে, মরতে রাজি আছি আমি। নির্ঘাৎ নাটবল্টু ঢিলা এই লোকটির, বলে কি! ছটফট করে উঠলো সুজুকি। এসে কান্নাকান্না ভাব নিয়ে বললে, আমাদের ভ্যালুয়েবল লাইফ নিয়ে ছেলেখেলা করার কোনো রাইট নেই আপনার, দিয়ে দিন যা চাচ্ছে, আমার ভীষণ কান্না পাচ্ছে, ওহ্-নো, প্লীজ– ! ফাইন অ্যাকটিং, রাফ র‍্যাংলার প্যান্টে টেরিফিক লাগছিলো ওকে, নটিগার্ল! এবারে সত্যি সত্যিই হেঁচকি তুলে কেঁদে ফেললে সুজুকি, এই লোকটির জিদের জন্যে আমাদের মরতে হবে, উ ম্যাগো! আশ্চর্য, লোকটি তখনো অনড়। বিজ্ঞের মতো বললে, জিদ না থাকলে বাংলাদেশ কোনোদিন স্বাধীন হতো, এ্যাঁ! লেব্বাপ, বলে কি লোকটা, যেন ওই এনোফিলিসটাই ইন্ডেপেন্ডেন্স এনেছে! অগত্যা কাউন্টিং স্লো করতে হলো। বল্টুটা একটা ভাবদা মাছ, ননসেন্সটার বুদ্ধি সব সময় একটু দেরিতেই খোলে। সত্যি, মেয়েরা আমাদের তুলনায় ঢের বেশি শার্প, যেমন সুজুকি ইন্দিরা গান্ধী শ্রীমাভো বন্দোরনায়েক শ্রীমতি গোল্ডামায়ার। এই সেঞ্চুরিতে টেরিফিক প্রগ্রেস করেছে মেয়েরা। ওরা অনেক অ্যাডভান্স। সুজুকিকে টপে তুলতে হবে, খুবই শার্প, খুবই শার্প ওর ব্রেন। আমার কাউন্টিং যখন আট পর্যন্ত তখন তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো বল্টু, উঠেই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললে, এরা হাইজ্যাকার, বিদায় করুন এদের, এই বলে নিজের হাতেই হড়াম করে ড্রয়ারে টান দিলো সে। ড্রয়ারে এক বাণ্ডিল নোট, শুকুনটার বুকে ল্যুগারের নল ঠেকিয়ে বাণ্ডিলটা পকেটে ভরে নিলাম ঝটিতি, টাইফুন তখন দোরগোড়ায় পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে। কোনো বাধা দিলো না ক্যাশিয়ার কাম ম্যানেজার, দাঁড়িয়ে রইলো হাবার মতো, আশ্চর্য! হয়তো মনে মনে এতোক্ষণ এটাই চাচ্ছিলো এনোফিলিসটা। চাচ্ছিলো সবকিছু নিজেদের হাতেই আমরা করি, তাতে ওর স্যানিটি বজায় থাকে, চাকরির ব্যাপার যখন! খুব ভালো করেই আমরা এসব সাইকোলোজি বুঝি। সেলসম্যান তিনজন আড়চোখে দেখতে লাগলো আমাদের, ভাবলেশহীন। ওদের আমরা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনি না। ওরা প্রলেতারিয়েৎ, বুর্জোয়া বাস্টার্ডদের জন্যে কোন দুঃখে মরতে যাবে! সমাজতন্ত্রের সঙ্গে কথাবার্তা সব পাকাপাকি, এখন শুধু সামিয়ানা খাটিয়ে ভেঁপু বাজিয়ে বিরিয়ানি খাইয়ে ঘটা করে ঘরে তোলার অপেক্ষা। ডেস্ক কাউন্টারের ওপরে হাত রেখেছিলো শালার মসকুইটো, হয়তো ভুলক্রমেই, আঙ্গুলগুলো থেঁতলে দিলাম। বললাম, কোনোরকম শাউটিং করবে না

www.nagorikpathagar.org

গুদামবার্স্টার্ড, ছাতুছানা করে দেবো, উল্টোদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকো। যন্ত্রচালিতের মতো সকলে তাই করলো। বল্টু ডিনামাইট আর সুজুকিই অবশ্য এ ব্যাপারে বেশি উদ্যোগী। ডিনামাইটের মুখ যাকে বলে একেবারে ম্যাড়ামার্কা, এখন কে বলবে জুডোকারাটের একস্পার্ট ছোকরা ও। স্যুপার্ব এইমিং-এ ওর জুড়ি নেই, প্রয়োজন হলে দু'দশজনকে একাই ঘায়েল করে দেয় ডিনামাইট। সে যাক। আমি আর টাইফুন বেরিয়ে এলাম। পঞ্চশ গজ দূরে একটা লাল টয়োটা দাঁড় করানো ছিলো আমাদের-ভুশ্। ঝড়ের বেগে কেটে পড়লাম। ন্যুমার্কেটের গেটে গড়িটাকে পার্ক করে সরে পড়লাম দু'জন, এখন আর কোনো প্রয়োজন নেই ওটার, খেল খতম। এসব জিনিস ল্যাংবোট করার কোনো মানে হয় না, ভীষণ রিস্কি, যে কোনো সময় ধরা পড়ার চান্স থাকে। খেয়াল করে দেখেছি গাড়িওয়ালারা নিজেদের গাড়িকে কেপ্টের চেয়েও বেশি ভালোবাসে, আমিই ওয়ার্ল্ডের একমাত্র ব্যতিক্রম, গাড়ির ব্যাপারে আমার কোনোরকম সুবারি নেই, ভাবালুতা নেই। থাকলে থাকলো, গেলে গেলো,আছে একখানা ইসুজু ব্যালেট, এই পর্যন্তই! সুজুকি অবশ্য গাড়ির ব্যাপারে ফুল্লি কনশাস, নতুন মডেলের প্রতি ওর দারুণ ফ্যাসিনেশন। যে যাই বলুক সুজুকি কিন্তু টেরিফিক মেয়ে। ডিনামাইট বলে টম্বয়, টাইফুন বলে ভোলাপচুয়াস, আর আমি বলি আমাদের দেশে এমন ফরোয়ার্ড মেয়ে, ভাবাই যায় না। এই যে ছ্যাকড়ামার্কা পুরনো মূল্যবোধকে ধনাদ্দন ভেঙ্গে দিচ্ছে, এ ব্যাপারে ওর রোল কি ঐতিহাসিক নয়! কবে যে বাংলাদেশের মেয়েরা সবাই সুজুকির মতো হবে! তখন হয়তো আমরা কেউই থাকবো না, আমরা শুধু নিজেদের স্যাক্রিফাইস করার জন্য জন্মেছি তারপর সোজা সাংহাই, এখানেই সকলে সকলের জন্যে অপেক্ষা করার কথা। আধঘণ্টাও লাগলো না সকলের একত্রিত হতে। প্রথমে এলো সুজুকি, ডিনমাইটের হাতে জুতোর বাক্স। সব শুনলাম ওদের মুখ থেকে। আমরা চলে আসার পর মসকুইটো ব্যাটা বল্টু ও সুজুকিকে উল্টোপাল্টা কথা বলার চেষ্টা করলেও বিশেষ এঁটে উঠতে পারেনি। এ ব্যাপারটা সুন্দরভাবে ম্যানেজ করে দিয়েছে ডিনামাইট। সে একটা রং টেলিফোন নাম্বার দিয়ে শান্ত করে বেচারাকে। সে বলেছে, প্রয়োজন হলে এই নাম্বারে আমাকে ডাকবেন, আমি সাক্ষি দেবো, এ ব্যাপারে আপনি যে কতো হেল্পলেস ছিলেন স্বচক্ষেই তো তা দেখেছি। একটা ব্যাপার আছে এখানে। বল্টু-সুজুকি আর ডিনামাইটের মধ্যে কোনো মিকসাপ্ করানো হয়নি। যাই হোক, সকলের সামনে টাকার বাণ্ডিলটা বের করা হলো, হোপলেস, মাত্র আড়াই হাজার। রিস্কের তুলনায় একেবারে যা-তা অ্যামাউন্ট। আমাদের সকলের মুখ কালো হয়ে গেল। পুওর সুজুকি, এমন মেয়ের মুখ কালো দেখা যায় না। কিন্তু আমার কি দোষ, আমার তো কোনো হাত নেই এতে! কি আমি করতে পারি, কি এমন করতে পারে ড্রাকুলা। ড্রাকুলা শুধু পারে– না থাক!

www.nagorikpathagar.org

কি আশ্চর্য! আমি এসব লিখছি কেন, এতোদিন পরে হঠাৎ আজ একথা মনে উদয় হয়েছে, কি এমন প্রয়োজন এসবের। ভাবালুতাকে আমি ঘৃণা করি, ভাবালু ভাবালুতা, ফাকাপ ভাবালুতা, হেট করি ন্যাকামিপনাকে। কৃতকর্মের জন্যে আমার মনে তো কোনোরকমের কোনো খেদ নেই, কোনো আক্ষেপ নেই, তবু কেন এসব। নির্বিকারচিত্তে আমি একাধিক মার্ডার করেছি, প্রয়োজন হলে আরো করবো; মেরুদণ্ডহীনদের বেঁচে থাকা আর না থাকা সমান। মাছি মেরে হাত গন্ধ করা, এর বেশি কিছু নয়। কিন্তু লিখছি কেন এসব। আমি অনেক ভেবে দেখেছি, আমাদের কথা বিশ্ববাসীর জানা দরকার। পতন আমাদের অবধারিত, পাকিস্তানী বাহিনীর পতন যেমন অমোঘ ছিলো, আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো। বেশি কিছু নয়। ডিসিশনে একটু ভুল কিংবা একটু অসাবধানতা এই-ই তো আমাদের জন্যে অ্যানাফ। সত্যি আমাদের কথা বিশ্ববাসীর জানা দরকার। হে মহান বিশ্ববাসী শোনো, আমরা তোমাদেরই নষ্ট সন্তান, আমাদের বুকে নিদারুণ জ্বালা, কোনো হুইস্কি-ব্র্যাণ্ডি এ জ্বালা নেভাতে পারে না, ঈশ্বরের খেয়ালখুশি চরিতার্থ করার জন্যেই আমরা জন্মেছি। আমি মনোয়ার হোসেন ছিলাম, ঈশ্বরের খেয়াল আমাকে ড্রাকুলা করেছে। এইভাবে গিয়াস হয়েছে ডিনামাইট, মজিদ হয়েছে বল্টু, তৌফিক হয়েছে টাইফুন, আর রেবা সুজুকি! মনোয়ার রেবাকে এভাবে হত্যা করলো কে? হে ঈশ্বর তোমার দুর্দান্ত খেয়াল! আমি একে শয়তানি বলবো! ঈশ্বরের শয়তানি! হে মহান বিশ্ববাসী শোনো, অনেক কষ্ট ভোগ করে গেলাম আমরা, অনেক জ্বালা, কেননা শত চেষ্টা করেও আমরা সুস্থির হতে পারিনি। আমি ড্রাকুলা হতে চাইনি! আমি ড্রাকুলা হতে চাইনি!

কি ভালোবাসি :

ইন্টিমেন্ট কোলোন,ফিল্টার টিপড ক্র্যাভেন, রণসন লাইটার, রোলিংস্টোনের রেকর্ড, ব্ল্যাকজনি, পাইথনের চামড়ার বেল্ট, রেডইণ্ডিয়ানমুখো ষ্টার্লি রিঙ, ল্যুগার, সিলভিক্রিম হেয়ার অয়েল, রেবেন সানগ্লাস, টিসট ঘড়ি– আমি এইসব ভালোবাসি! জানি না! এসব তো ভালোবাসার জিনিস নয়, প্রয়োজনের জিনিস। প্রয়োজন আর ভালোবাসা এক কিনা আমার তা জানা নেই। না থাকলেও, আমি নিঃসন্দেহ এ ব্যাপারে, এসব ভালোবাসার সামগ্রী নয়। এক সময় মাকে বোধ হয় ভলোবাসতাম। লুলু, আমার ছোটবোনটাকেও। মিক্সড্‌পার্টি অ্যাসিড, এইসবে ডুবে আছে এখন লুলু, ওকে পাওয়াই যায় না। ওর বয়ফ্রেণ্ডটাকে একটুও পছন্দ নয় আমার, ওর ভাবসাবে লোক দেখানোর একটা গুরুতর প্রচেষ্টা আছে, সিলি! মা আর লুলু দু'জনকেই এখন আমার ভীষণ ভালো লাগে। কি জানি কেন! ভালোবাসা জিনিসটা আসলে কী? সুজুকি যেমন বলে, ভীষণ

www.nagorikpathagar.org

ভালোবাসি! এলিজাবেথ আর্ডেন এর মেকাপের প্রসঙ্গে কিংবা ফ্রেঞ্চ ফিল্ম কিংবা ফ্রেঞ্চ পারফিউমের প্রসঙ্গেও তাই, অর্থাৎ ভীষণ ভালোবাসি! নিজেকে উপভোগ করার ভেতরে এক ধরনের নির্বোধ আনন্দ আছে, মঙ্গোলিয়ানদের চেহারার মতো চোখনাক বোঁজা আনন্দ। কিন্তু সে আর কতোটুকুই বা। বেঁচে থাকার জন্যে এ আনন্দ কী যথেষ্ট? জানি না। তবে হ্যাঁ, নিজেকে কষ্ট দেবার ভেতরেও তীব্র আনন্দ আছে, রিয়েলি টেরিফিক এ আনন্দ! এই আনন্দকেই কী আমি ভালোবাসি? জানি না! জানি না

ড্রাকুলা ও মনোয়ার :

আমার মনে পড়ে মনোয়ারকে। এ এক ধরনের শোক, মৃত মানুষের জন্যে শোক। সত্যি এটা একটা টেরিফিক অভিজ্ঞতা; নিজেকে হত্যা করে সেই নিহতের জন্যে কষ্ট পাওয়া, মন্দ কি! ড্রাকুলা মনোয়ারের জন্যে কষ্ট পাক, এই কষ্টই তাকে সত্যিকারের ড্রাকুলার পথে নিয়ে যাবে। অবশ্য মনোয়ার ড্রাকুলা হতে চায়নি, মনোয়ার চেয়েছিলো মার্কুইস দ্য সাদ হতে। এটা টাইফুনের বজ্জাতি। টাইফুনটা একটা কুত্তার বাচ্চা। ইমপোটেন্ট টাইফুন। ড্রাকুলা নামের প্রস্তাবটা ওরই ছিলো, ও জানতো ব্যক্তিগতভাবে আমি মার্কুইস নামটাই বেশি পছন্দ করি। অদ্ভুত কমপ্লিকেটেড ওর ক্যারেকটার, যা হয় ইমপোটেন্টদের। সাংঘাতিক ক্লিকি। দারুণ অভিনয় জানে কুত্তার ছাওয়ালটা। মেয়েদের ব্যাপারে ওর ভূমিকা সেন্টের মতো, কেননা এ ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই ওর। কিন্তু সুজুকি ও বল্টুর মতো নাদামাদা গুড-ফর-নাথিং এর পক্ষে এতোটা বাড়াবাড়ির পিছনে নিশ্চয়ই কারো চতুর হাতের কলকাঠি নাড়ানোর ভূমিকা আছে। এই তো সেদিন সকলের চোখের সামনে সুজুকিকে প্রেজেন্ট করলে বল্টু বিশ্রী কতোগুলো জিনিস। যেমন, ল্যাকমে লিপস্টিক, কান্তা সেন্ট, ক্যালিকো রুমাল আর এক বাক্স স্যানিটারী টাওয়েল। সমগ্র পুরুষজাতের মুখে চুনকালি লেপে দিলো শুয়োরের বাচ্চা। বাজারে কি না নেই! রেভলঁরে লিপস্টিক, নিনা রিচি শ্যানেল, চেকোশ্লাভ রুমা, সবই পাওয়া যায়। আশ্চর্য, সুজুকি হাসিমুখে ওগুলো গ্রহণ করলো। ভেবেছিলাম ছুঁড়ে ফেলে দেবে সকলের চোখের সামনে। কিন্তু ও তা করলো না। মেয়েরা সত্যিই এক একটা চীজ। হয়তো বাড়ির ঝি-চাকরানিদের জন্যে জিনিসগুলো নিলো, সে, কিন্তু রুচি বলে একটা কথা আছে। যে মেয়ে এলিজাবেথ আর্ডেনএর কসমেটিক ছাড়া অন্য কিছু ব্যবহার করে না, যে মেয়ে ফ্রেঞ্চ পারফিউম ছাড়া অন্য কিছু চেনে না তার কাছে এসব অপ্রত্যাশিত। মেয়েদের নিজস্ব গ্রামারে স্থূলরুচির কুমড়োরাই সবচেয়ে ভালো মক্কেল, ভালো অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত পা-চাটা ক্রীতদাস। ভাবতে পারি না, হলিক্রসে পড়া

www.nagorikpathagar.org

সুজুকির মতো অমন আপস্টার্ট মেয়ে কি করে একতাল ষাঁড়ের গোবরকে সকলের চোখের সামনে আস্কারা দেয়। পাছাভারী পুরুষ আমার দু'চোখের বিষ। ইচ্ছে করে একধারসে ঐগুলোকে বেছে বেছে লাথি মারি। ভারী পাছা দুলিয়ে বল্টুব্যাটা যখন হাতে 'পাইপটিপাইপ' (বল্টুর উচ্চারণ) এর প্যাকেট নিয়ে মচরমচর করে হাঁটে তখন রক্ত গরম হয়ে যায় আমার, একটা ক্যাপসুলই কুমড়োটার জন্যে যথেষ্ট। বল্টু-জীবনের সবচেয়ে বড়ো ঐতিহাসিক ঘটনা, 'ববি,' ওর মতে 'ওয়ার্ল্ডের মধ্যে বেষ্ট'। শুয়োরের বাচ্চা! কিন্তু আসল কালপ্রিট কে? টাইফুন। ডিনামাইট আরা ড্রাকুলাকে কোণঠাসা করে ও আনন্দ পায়, লেডিকিলার হিসেবে এই দু'জনেরই সুনাম আছে, সুদর্শন তো বটেই। টাইফুনই মদদ জোগাচ্ছে ওদের। ওর সব অভিসন্ধিই কূট।ওর টার্গেট ড্রাকুলা আর টাইফুন। কিন্তু টাইফুন, মনে রেখো কমরেড মনোয়ার যদি ড্রাকুলা হতে পারে, ড্রাকুলার মার্কুইস হতে হতে কতোক্ষণ! সাবধান বন্ধুরা। বিভীষণের জাগরণ তোমরা দেখোনি! সাবধান বন্ধুরা মার্কুইস! মার্কুইস। ঐ যে ডিভাইন মার্কুইস!

এলিফ্যান্ট রোডের এক পরিচিত গ্যারেজে গাড়িটাকে রেখে মনোয়ার ওরফে ড্রাকুলা বেরিয়ে এলো। পিঠেপিঠি কয়েক দিন থেকে ট্রাবল দিয়ে আসছে গাড়িটা। বিরক্তি ধরে গেছে মনোয়ারের, থরো চেকাপ দরকার, সার্ভিসিংও হয়নি বহুকাল।

কয়েক দিন থেকেই মন ভালো যাচ্ছে না মনোয়ারের। মন ভালো না থাকলে সাধারণত সে ডায়েরি লেখে। মন ভালো না থাকলেই সে মৃত্যুর গন্ধ পায়, দ্রুত লেখালেখি শুরু করে।

ডায়েরি লেখা তাকে মৃত্যুযন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি দেয়।

ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্র, মাথার ঠিক উপরে গনগনে সূর্য; এতো আলো ঠিক বরদাস্ত হয় না মনোয়ারের। চারপাশের সকল দৃশ্য তার চোখে বিসদৃশ মালুম হয়; এলোমেলো, ছড়ানো ছিটানো, বিশৃংখল।

পায়ে পায়ে হাঁটতে থাকে মনোয়ার। মানুষজনের মুখের দিকে তাকিয়ে বিজাতীয় ঘৃণায় তার গা গোলায়, কি নির্বিকার, কী ভরপুর! এদের এতো সুখের উৎসটা কী!

কৃমিকীট কৃমিকীট

পকেটের ল্যুগারের কথা মনে পড়ে। ল্যুগার দ্রুত উত্তেজিত করে ফেলে তাকে। ট্রাফিক আইল্যাণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে একটা একটা করে এই নির্বোধ ও নেড়ীকুত্তার মতো মানুষগুলোকে খতম করে দেবার কথা মনে তোলপাড় করে।

এমন একটা চেহারা নেই, যাকে বলা যায় আপোসহীন। মেরুদণ্ডহীন ক্রীতদাসের পাল কিলবিল করছে চতুর্দিকে।

মনোয়ারের দৃঢ় বিশ্বাস এদের বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই, কেননা এদের অস্তিত্ব পৃথিবীকে এক ইঞ্চিও এগিয়ে দেবে না।

www.nagorikpathagar.org

ন্যাতাকাগজ কুড়োনো এক ন্যুব্জপৃষ্ঠ বৃদ্ধ পিঠে বস্তা নিয়ে হুঁটরে হুঁটরে এগিয়ে চলেছে। বৃদ্ধের সারা গায়ে থুকথুকে চর্মরোগ। ওকে শান্তি দিতে পারে একটি ক্যাপসুল, মনোয়ার মনে মনে দাঁত কিড়মিড় করে গাল দেয় বৃদ্ধকে।

ছেলে নিয়ে একটি মধ্যবয়সে ঢ্যাঙা লোক বিমর্ষ মুখে হেঁটে চলেছে, কাঁখে বোঁচকা, টুনুর টুনুর করে পিছনে পিছনে ছুটছে তার পরিবার, মুখ ঘুরিয়ে নেয় মনোয়ার নিদারুণ বিতৃষ্ণায়।

আজ তার হত্যা করার ইচ্ছা ভয়ানক তীব্র। টাইফুনের ধারণা এ ব্যাপারে তার হাত এখনো কাঁচা। এ পর্যন্ত মোট বারোটা স্কোর করেছে টাইফুন মনোয়ার মাত্র তিনটা। এই একটা ব্যাপারে সে পিছিয়ে আছে, মনোয়ারের মতো মাষ্টার ডিগ্রী তার নেই। মনোয়ার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, আজ থেকে নতুন করে হত্যাভিযান শুরু করবে সে, টাইফুনের মতো পিছন থেকে মেরে অন্ধকারে হাওয়া হয়ে যাওয়া নয়, মার্কুইসের মতো! বীভৎস হত্যাকাণ্ড চালাতে হবে তাকে, মনোয়ার মনে মনে পুলকে শিউরে ওঠে, প্রথমে একটা ক্যাপসুল, তারপর একটু একটু করে তার রক্ত পান করা, তারপর তার শরীরের বিশেষ কতোগুলো অংশকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা।

দুনিয়ার মানুষকে নিদারুণ হাস্যকর এক জীব বলে মনে হতে থাকে মনোয়ারের। ডিনামাইট ফাটিয়ে ফালতু কর্মকাণ্ডে মুখর গোটা বিশ্বের মাথার খুলি উড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে। দাঁত কিড়কিড় করতে থাকে মনোয়ারের, সে হিংস্র হয়ে যায়।

পায়ে পায়ে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে হাঁটছিলো মনোয়ার, ভিতরের দাঁতাল হিংস্রতা প্রতি মুহূর্তেই খোঁচা মারছিলো তাকে। একটা রিকসা নেওয়া দরকার, মনে মনে সে ভাবলো, একটা রিকসা ধরে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করলে হয়।

শাহবাগ মার্কেটের সামনে এসে সে দাঁড়ালো। কোনো রিকসা নেই, গাড়ির অভাব এই সময় তীব্র ভাবে পীড়া দেয়। টকটকে লাল সার্ট গায়ে একটি উষ্কোখুষ্কো মেয়ে তার পাশ কাটিয়ে স্টেশনারী দোকানে ঢুকলো। কাঁধে ঝোলাঅলা মেয়েটির চমৎকার স্বাস্থ্য,যে স্বাস্থ্য মানুষের সমস্ত দুঃখকে ভুলিয়ে দেয়। ভীষণ আনমনা হয়ে যায় মনোয়ার। কোথাও যেন একটা মিল আছে এর সুজুকির সঙ্গে। এর চাল-চলনে এমন একটি তাচ্ছিল্যের ভাব আছে, যা বিশেষ কোনো আদর্শ বা রীতিনীতি থেকে সাধারণত জন্মায়। হয়তো আর্ট স্কুলের ছাত্রী। মনোয়ার মনে মনে মার্কুইস দ্য সাদ হয়ে যায় এক মুহূর্তে।

ছ'সাত বছরের ন্যাংটো একটি স্ট্রিটআর্চিন মনোয়ারের সামনে এসে দাঁড়ায় এই সময়, তার কোমরে পেতলের ঘুন্টি ও কড়ি ঝোলানো। ওকে এক নজর দেখে নিয়ে অকারণে ফিক করে হাসে।

বাচ্চাটির ময়লা মুখের দুষ্টুমির ছাপ সমস্ত রৌদ্রকে নিঃশব্দে ঝলসে দিচ্ছে, নজর এড়ায় না মনোয়ারের।

www.nagorikpathagar.org

হঠাৎ চুনচুন করে তার চোখেমুখে কিছুটা পানি এসে লাগে, মনোয়ার চমকে ওঠে; যন্ত্রের মতো তার হাত চলে যায় ল্যুগারে।

বেলুনের ভেতর পানি ভরে মহানন্দে এই অপকর্মটি করে বেড়াচ্ছে শয়তানের ছাওয়ালটা। পা থেকে মাথা অবধি রি রি করে জ্বলে যায় মনোয়ারের; একটা ধমক মেরে প্রায় লাফিয়ে পড়ে সে বাচ্চাটির দিকে, ঘেটি ধরে এক আছাড় দেবে। কিন্তু পারে না, খিলখিল করে হেসে এক দৌড়ে সে পালায়। তারপর আবার চাপ দেয় বেলুনে, ফলে আর এক পশলা বৃষ্টি হয়। নির্বোধ শিশুর সারল্যে তার মুখ এমনই উজ্জ্বল যে মনোয়ারের হাবার মতো দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না।

www.nagorikpathagar.org

রিজিয়ার পাপ

'নুরু আছো নাকি নুরু?'

দরোজায় কড়া নাড়ার শব্দ বেজে উঠতেই টান টান হয়ে বসলো নুরুদ্দিন।

এতোক্ষণ চুলের জট ছাড়িয়ে দিচ্ছিলো রিজিয়ার।

চোখ নাচিয়ে চিরুনি দিয়ে একটা খোঁচা মারলো সে রিজিয়াকে।

খাটো গলায় বললে, 'কি-রে, দেখলি তো! চাঁদ-সুরুজের হেরফের হতে পারে, কিন্তু এসব মানুষের কথার এক সুতোও নড়চড় হয় না। বলিনি, কথা যখন দিয়েছে তখন আসবেই। মতলুব সাহেব, মতলুব সাহেব।'

রিজিয়া চাপাস্বরে বললে, 'কে না কে আগে দেখোই– '

ফেটি বাঁধা লাল গামছাখানা মাথা থেকে খুলে কাঁধের উপর ঝটিতি ফেলে দৌড় দিলো নুরুদ্দিন। তারপর অভ্যেস মতো দরোজার পাল্লার একটা নির্দিষ্ট ফুটোয় চোখ মেরে পরক্ষণেই হুড়কো খুলে একপাশে সরে দাঁড়ালো।

'আছো তাহলে, যাক বাবা!'

'ভেতরে আসুন, ভেতরে আসুন, ছেড়েই দিয়েছিলাম আপনার আশা!'

'আমার দেরি দেখে যদি বেরিয়ে গিয়ে থাকো, ভয় হচ্ছিলো, কার না কার পাল্লায় পড়ি আবার– ' ঘরে ঢুকে বাঁ-চোখ কুঁচকে চারপাশ নিরিখ করতে করতে মতলুব সাহেব একথা বললেন।

'ঘর বের করতে কোনো অসুবিধা হয়নি তো?'

'পানির মতো– '

তিনটে বেঁতের চেয়ারের একটি খরখর করে ঘরের মাঝখানে টেনে আনলো নুরুদ্দিন। কাঁধের গামছা দিয়ে ফটাফট্ কয়েকটা বাড়ি মেরে বললে, 'বসুন এখানে।' গা ছেড়ে দিয়ে বসে সিগ্রেট ধরালো মতলুব সাহেব। ঠিক যেন খাপ খাওয়ানো যাচ্ছে না কোনো কিছুই. যুতসই হচ্ছে না, এমন একটা মুখভঙ্গি করে বললেন, 'বড্ড অন্ধকার হে তোমার ঘরটা। কেমন যেন ঘুটঘুটে, গুমো গন্ধ– '

www.nagorikpathagar.org

'তা তো হবেই– ' মুখের কথা কেড়ে নিয়ে নুরুদ্দিন অপরাধীর মতো আমতা আমতা করে বললে, 'আলো-বাতাস একবারেই খেলে না। ওপাশটায় মেস, সবসময় জানালা-দরোজা বন্ধ রাখতে হয়। খুব যে একটা ভালো পাড়া তা-ও নয়, বলতে পারেন সাহসের জোরে টিকে আছি! অবশ্য বাড়িঅলা সবই জানে, তার জোরেই জোর– '

'তা কি করে বাড়িঅলা লোকটি?'

'বাজারে দোকান আছে, ডিমের পাইকার।'

'বলছো জেনেশুনেই তোমাকে ভাড়া দিয়েছে?'

'জেনে-শুনেই!! এমন কব্বোরখানায় তা না হলে আর কোন ভূতে থাকতে যাবে বলুন! মোটে ষাট টাকা ভাড়া ছিলো আগে, তা-ও প্রায় বছরখানেক থেকে খালি পড়ে ছিলো। আমাকে ফাঁসিয়েছে তিনশো টাকায়, বুঝলেন না কেসটা?'

'বুঝলাম!'

'এই হচ্ছে ব্যাপার! তাছাড়া গ্যাঁজাম হলেও না হয় একটা কথা ছিলো, বলতে পারেন কোনো রকমের হুড়ুম-দাড়ামই এখানে হয় না। আমি খুবই নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ। আধপেটা খেয়ে থাকি সেওবিয়াচ্চা, কিন্তু বেশি কাস্টমারকে কখনোই পাত্তা দেই না। আমার সব কাস্টমার হাতে গোনা, প্রায় আপনার মতোই সবাই। সকলেরই আছে মান-ইজ্জতের ভয়, কাঁছা খুলে ফুর্তির নামে হামদুম এখানে চলে না। গ্যাঁজাম যা হয় বাড়িওয়ালার নিজের ঘরেই। প্রায়ই চুলোচুলি বাধে দুই সতীনে, যাকে বলে বাঙালি-বিহারীর রায়ট– '

'সে যাকগে, আমি কিন্তু সন্ধ্যে পর্যন্ত থাকবো, অসুবিধে নেই তো তোমার?'

'অসুবিধে আবার কি, আমি তো জানিই আগে থেকে, সারাদিনের জন্যে আপনি রিজাপ্ করবেন। দু'একজনের আসার কথা ছিলো ঠিকই, কিন্তু আমি নিজে দেখা করে বুঝিয়ে এসেছি তাদের। আর নিতান্তই যদি হুট করে কেউ এসে যায় সে আমি কাটিয়ে দিতে পারবো। পয়সার অতো লোভ থাকলে– '

'তুমি একটু বেশি কথা বলো, বুঝলে লাইনের কথা আমি বুঝি। আমিও ঢের ঢের বাস্তঘুঘু চরিয়ে খাই। আমার সঙ্গে সব সময় সোজা কথা বলার চেষ্টা করবে। কই, তোমার জিনিস কই?'

নুরুদ্দিন ভড়কে যায়। কেমন যেন বিগড়ে আছে মতলুব সাহেবের মেজাজ, অথচ যোগাযোগের সময় ঠিক এই ধাতের মনেই হয়নি মানুষটাকে, হাসিখুশি, ভালো মানুষ। লোকটা যে বেজায় ঘোরেল এবং ঠোঁটকাটা, এখন তা বোঝা যাচ্ছে। কিছুটা কড়াধাতের ঠিকই, কিন্তু আলগা ডাঁটও আছে; ঔদাসীন্য যা আছে তা কেবল ওপর ওপরই, নুরুদ্দিন চটপট এইসব সিদ্ধান্তে আসে।

সে হাত কচলে বললে, 'পাশের ঘরেই আছে, একটু ঠিকঠাক করে নিচ্ছে ঘরদোর– '

www.nagorikpathagar.org

'মাল-টাল আছে তোমার স্টকে?'

'বোতলের কথা বলছেন?'

'তবে আবার কী– '

'নেই, তবে বললে এনে দিতে পারি। পাকিস্তানের সময় হলে– '

'কতো দেরি হবে?'

'এই যাবো আর আসবো, ধরুন আধঘণ্টা'

'গুড'

ফাড়া নীল লুঙ্গির ঝুলজুলে পর্দা সরিয়ে ভিতরে কামরায় ঢুকলো নুরুদ্দিন। কালো ফিতের একটা প্রান্ত দাঁতে কামড়ে চুলের গোড়া কষছিলো সে। নুরুদ্দিন আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে বললে, 'হলো তোর?'

'বিছানার উপর ঝুঁকে একটা বালিশ টেনে নিলো নুরুদ্দিন। দুপদাপ করে দু'চারটে থাবড়া মারলো। স্টীলট্রাঙ্কের ওপর থেকে মার্কিন কাপড়ের একটা ফালি টেনে নিয়ে বালিশের গায়ে বিছিয়ে দিলো, তেলচিটচিটে বালিশ, আবার না খাঁউ করে ওঠে বড়লোকের নাতি।

'তোর না, আচ্ছামতোন একটা ধাঁতানি দরকার, এতোক্ষণ লাগে নাকি?'

'বাব্বা, একেবারে ঘোড়ায় চড়ে এসেছে নাকি?'

'চুপ কর মাগী, চটপট হাত চালা, যা টেঁটিয়া মেজাজের লোক!'

রিজিয়ার ইচ্ছে ছিলো বেণী গাঁথার, তাড়া খেয়ে ঝটিতি এলোখোপা করে নিলো। চোখে কাজল টানা, গালে-মুখে পাউডারের পাফ বোলানো, সবকিছুই যন্ত্রচালিতের মতো তড়িঘড়ি সেরে ফেললো। শাড়ি সে আগেই বদলে নিয়েছিলো, লালপেড়ে বাসন্তীরঙের শাড়ি। এই একটাই পরনের যোগ্য, আর তো সব ন্যাতা।

এই সময় ঢিবঢিব করতে তাকে বুকের ভেতর, সারা শরীর ঝিনঝিন করতে থাকে। নতুন কাস্টমারের সামনে যাবার আগে কী যে হয়, প্রতিবারই এক একটি ফাঁড়া। কোনো কোনোদিন হাত-পা প্রায় পড়ে যায়। রিজিয়া নিজে একটা কারণ খুঁজে বের করেছে এই সবের, পাপের ব্যাপারটাই সম্ভবত এমনিই, জানান না দিয়ে একেবারে হুট করে কখনোই পাপ পা বাড়ায় না; দেহের যাকে বলে ভিতরকুঠিতে ঢুকে হেঁয়ালির গোছা গোছা শিকড় ধরে আচ্ছামতো নাড়া দেয়, পিঠব্যথার মতো একটা দাঁতাল মোচড়ানি ভীষণ কষ্টদায়ক হয়ে উঠে। 'আচ্ছা কি হবে আমার' ডুবে যাওয়া মানুষের মতো সে তখন হাসফাস করতে থাকে। অলস স্তব্ধতা শেষ পর্যন্ত তাকে হাওয়ায় কাঁপা অগ্নিশিখার মতো এই সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলে দেয়– সবকিছুর দায়ভার একা বোকড়া দেঁতো নুরুদ্দিনের, গুণধর স্বামীরত্নের, কারো কোনো হাত নেই এতে। এই হড়কামাঠ লোকটির হাড়ে ভেল্কি খেলে। কতো রকমেই না সে কলকাঠি নাড়তে জানে; সে, রিজিয়া, তার নিজের অসহায়তাকে ধানচালের মতো

www.nagorikpathagar.org

তুলে দিয়েছে এই ফন্দিবাজ চামড়ার কারবারীর হাতে, মাটিতে পড়া ডুমুর, গোমর করে কি হবে।

এক রকম তৈরিই সে, কিন্তু হাতে পায়ে যেন খিল ধরেছে। কপালের একটা রগ চিড়িক চিড়িক করে লাফাচ্ছে। অসম্ভব দাপাদাপি। মেরুদণ্ডের ভেতর কটকটানি, ঝিরঝিরে অবসাদ ক্রমাগত ছোবল মেরে যাচ্ছে, মানুষটা ডাকাত, ডাকাতের হাতে পড়েছে সে, মানুষখেকো ডাকাত। মনে মনে সে বললে,– 'আচ্ছা বিষ দিয়ে মারা যায় না এই বোকড়া দেঁতো রাক্ষসটাকে– '

এই মতলুব সাহেবের কথা আজ তিনদিন যাবৎ নুরুদ্দিনের মুখে শুনে আসছে সে। মতিঝিলে নিজের বিরাট অফিস এই লোকের, রাজহাঁসের মতো সাদা ধবধবে একটা গাড়িও আছে, অগাধ পয়সার মালিক।

নুরুদ্দিন মুখে ফেনা তুলে যতো গালগপ্পোই ফাঁদুক না কেন, ভেতরে ভেতরে সে আগের মতোই কাঠ হয়ে থেকেছে। কতো ঘাটের রাঘব বোয়াল যে সে এইএক বছরে বুকে তুলেছে তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। একটা হ্যাংলা কুকুর যাবে, আর একটা আসবে চ্যাটচুট করে তার গা চাটতে, হিসেব রেখে কি হবে। চাড়াল নুরুদ্দিনকে তো সে হাড়ে হাড়েই চিনেছে, কাউকে যখন সে আসমানে চড়ায় তখন কাঁছা খুলেই চড়ায়; কাস্টমারের টাকা পয়সা ধন-দৌলতের গপ্পো ফেঁদে নুরুদ্দিন কি যে তৃপ্তি পায় সে তা বোঝে না; এমনভাবে নাক মুখ দিয়ে গল্পো ঝাড়ে যেন সেসব ধনৈশ্বর্য তার নিজেরই। এই লোক সম্পর্কে আরো কি কোথায় সব বলেছিলো নুরুদ্দিন, খেয়াল করে তার সব কথা সে শোনেনি। কোথায় না কোথায় মতলুব সাহেবের বাপের নাকি মস্ত জমিদারি ছিলো, এখন সেসব লাটে উঠেছে, বিস্তর বিস্তর সব গপ্পো। হবেও বা। আর হলেই বা কার কি। বাজারের ফড়িংমার্কা ফড়ে থেকে বড় বড় কোম্পানির চাঁছাছোলা জাঁদরেল জাঁদরেল সাহেবসুবো, কিংবা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া দাড়ির জঙ্গলে আতর আর খেজাবের ছোপ ধরানো বুড়োভাম, কার না পা পড়ে ওখানে। ছিটকিনি তুলে যখন তারা উদোম হয়, তখন আর কারো সঙ্গে কারো কোনো তফাৎ থাকে না, থাকলেও রিজিয়ার চোখে কখনো তা ধরা পড়েনি। পর্দা ঠেলে মতলুব সাহেব ঢুকলেন এক ফাঁকে।

বললেন– 'এই বুঝি?'

কুটুস করে দাঁত নিয়ে নখ কেটে নুরুদ্দিন বললে, 'আপনাকে নামে চেনে, ওর কাছে অনেক গল্প করেছি আপনার।'

'নুরুদ্দিনের কথা গায়ে না মেখে চশমার আড়াল থেকে নরোম সপ্রতিভ দৃষ্টিতে তাকালেন মতলুব সাহেব রিজিয়ার দিকে।

বললেন, 'কি হে, ভড়কে গেলে নাকি, এমন জবুথবু কেন, কি নাম?'

'রিজি' মুখ না তুলেই উত্তর দিলো রিজিয়া।

'বাহ্! চড়ুই পাখির মতো কি সুন্দর ছোট্ট নাম। বারবার ডাকা যাবে– '

www.nagorikpathagar.org

নুরুদ্দিন আড়ষ্টপ্রায় রিজিয়ার কাঁধের পাশে ঝুঁকে বললে, 'ভাগ্য ভালো না হলে এসব মানুষের পা পড়ে! রাজা মানুষ, ভালো ব্যবহার করবি, যেন বদনাম না হয়– '

বাধা দিয়ে মতলুব সাহেব বললেন, 'তুমি লোকটা বড্ড ফাজিল, এতো বাজে বকো!

নাও ধরো, ঝটপট চলে আসবে– '

মতলুব সাহেবের হাতে কতোগুলো নোট।

নুরুদ্দিন গায়ে একটা হাফসার্ট গলাতে গলাতে বললে, 'কি আনবো, হুইস্কি জিন না রাম?'

'হুইস্কি পেলে হুইস্কি, না পেলে জিন। সিগ্রেট নিয়ে এসো প্যাকেট দুয়েক, বেনসন-টেনসন যা পাও– '

সদর দরোজার হুড়কো লাগানোর কথা বলে নুরুদ্দিন থলে হাতে বেরিয়ে গেল।

দরোজা লাগিয়ে ফিরে এলো রিজিয়া।

এই প্রথম চোখাচোখি হলো, ভালো করে দেখলো সে মতলুব সাহেবকে। একদৃষ্টে তার মুখের দিকেই তাকিয়ে আছেন। এমন তীব্র চাহনি, যেন ইচ্ছে করলেই এক নিমেষে সবকিছু আত্মসাৎ করে ফেলতে পারেন।

রিজিয়া দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। তার হাত পা কাঁপতে থাকে। মেরুদণ্ডের ভেতর বয়ে যায় শিরশিরে ছুরির স্রোত। মনে মনে ভাবতে থাকে, 'আচ্ছা কোথায় দেখেছি এই মানুষটিকে– '

'এদিকে এসো রিজি'– কোমল গলায় তাকে কাছে ডাকলেন মতলুব সাহেব।

দূরে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ পা ঘষাঘষি করে শেষ পর্যন্ত সামনে গেলেও সে তার ভিতরের থরথরানিকে অগ্রাহ্য করতে পারে না, যেন কোমলতার ভেতরে মতলুব সাহেব লুকিয়ে রেখেছেন বিষধর সাপ, ছোবল মারবে।

একটা হাত বাড়িয়ে কোমর বেষ্টন করে তাকে কোলের দিকে টানলেন মতলুব সাহেব। 'আমাকে একটা চুমু দাও– ' বলে দু'চোখ বন্ধ করলেন ভদ্রলোক।

রিজিয়া ঘাড় কাত করে থাকে।

এসব তার আসে না। কতো কাস্টমার কতো অভিযোগই তো করে নিত্যরোজ নুরুদ্দিনের কাছে। টাকাপয়সা লেনদেনের সময় ফ্যাকড়া বাধে, তর্কাতর্কি হয়; মাঝে মাঝে মেজাজ বিগড়ে গেলে তাকে ধরে গোবেড়োন দেয় একচোট, এমনিতে তার তো একটা বরাদ্দ আছেই, পুড়ে পুড়েই তো রাঁধুনি হয়, নুরুদ্দিন খুব ভালো করেই তা জানে। এখন, এই মুহূর্তেও তার শরীর পাথরের মতো শক্ত, অনড়; অপদেবতার ভর।

'তুমি কি সুন্দর' মতলুব সাহেব আলতোভাবে ওর গালে ঠোঁট ছুইয়ে কয়েকটা চুমকুড়ি তুলে বললেন, 'ঠিক এইরকমটিই আমার চাই– '

www.nagorikpathagar.org

আগের মতোই ঘাড় ফিরিয়ে রইলো রিজিয়া। এসব কথার কি গুরুত্ব সে তা বোঝে না। বোঝার কোনো চেষ্টাই তার নেই। ঠাণ্ডা আর ভদ্রচেহারার মানুষগুলোর কাছেই সে সব সময় তার অসহায়তাকে চিনে নিতে পারে। ভেতরে ভেতরে এরা যে কতো ভয়ংকর, এতোদিনে সে সম্পর্কে তার মোটামুটি একটা ধারণা জন্মেছে। মানুষের হিংস্রতা যে কতো গোপন খাতে বয় তার ছিটেফোঁটা জেনেছে রিজিয়া।

শেষ পর্যন্ত একটা বালিশ টেনে সটান শুয়ে পড়লেন মতলুব সাহেব।

বললেন, 'কাছে বোসো, দেখো তো মাথায় পাকা চুল আছে কিনা?'

বসে বসে ঘাড় গুঁজে পাকা চুল খুঁটতে থাকে রিজিয়া। মানুষটার শরীরে ভুরভুরে মিষ্টি গন্ধ। অল্প-স্বল্প চুল পেকেছে ঠিকই, কিন্তু এমন কিছু নয়। মাথায় বিলি কেটে দেয় সে, দু'চোখ বন্ধ করে মড়ার মতো পড়ে থাকেন মতলুব সাহেব। আরামপ্রিয় মানুষ, সে বুঝতে পারে।

এইভাবে শুয়ে থাকতে থাকতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়েন মতলুব সাহেব, ধীরে ধীরে নাক ডাকতে থাকে তাঁর, গা-হাত-পা ছেড়ে দিতে থাকেন। রিজিয়া দেখেছে গাছের পাতায় নরোম রোদ একইভাবে ঝিম মেরে থাকে।

'আচ্ছা এ মানুষটি কে, কোথায় দেখেছি একে, নিশ্চয়ই দেখেছি– ' ক্রমাগত এইরকম মনে হতে থাকে রিজিয়ার।

ঘুমন্ত, সুতরাং খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখায় কোনো বাধা নেই, তার চোখ স্পষ্টতই সাহসী ও অনুসন্ধানী হয়ে ওঠে।

ধবধবে ফর্শা রং, একমাথা চুল, আয়ত চোখ, সবই তার চেনা। গলায় প্রায় অর্ধভাগ জুড়ে আবছা খয়েরী রঙের জড়ুল চিহ্ন, অচেনা বলতে এইটুকুই। কিন্তু এই লোমশ হাত, পুরু কবজি, হাতঘড়ির কালো চামড়া, এ সবই তার আগে দেখা।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে রিজিয়া।

এ যাবৎ যেসব মরদ তাকে খেলাতে হয়েছে– তাদের সকলের হাবভাবে সব সময় একটা রোগ ফেনিয়ে উঠতে দেখেছে, কিছু একটা চায় সবাই, যেমন ঠাঁই; মজা লুটতে আসে ঠিকই, কিন্তু অন্য কিছুই চায়, এই হেঁয়ালিপনা পুরুষজাতের ধরাবাঁধা। কোনো কিছুর অপেক্ষা না রেখে নিজেই নিজের ঠাঁই করে নিয়ে স্বচ্ছন্দে এই যে মতলুব সাহেব ভুরভুরে তন্দ্রায় ঢলে পড়েছেন, কে বলবে এর আড়ালেই তাঁর নৈতিক পৈশাচিকতা বর সঞ্চয় করছে কিনা

সত্যিকারের সুপুরুষ, কোনো সন্দেহ নেই রিজিয়ার।

তার চোখ ঝলসে যায়, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে নিজের সঙ্গে প্রায় যুদ্ধই চলতে থাকে, কিছুতেই মনে করে উঠতে পারে না এর আগে কোথায় দেখেছে।

অকাতরে ঘুমোচ্ছেন মতলুব সাহেব।

ঘুমন্ত মানুষের গলায় পোঁচ দেওয়া কতো সহজ, ইচ্ছে করলেই সাহস করলেই পারা যায়। ঘুমোয় নুরুদ্দিনও। মাছের মতো চোখ, চেয়ে ঘুমোয়। পোকাপুকির

www.nagorikpathagar.org

চলাফেরা, কিংবা ইঁদুর-ছুচোর আনাগোনাতেও 'হেই' করে ধড়ফড় করে উঠে বসে। তার ঘুম ভীষণ পলকা।

দু'একদিন মাঝরাতে রিজিয়ার খিদে পায়, উঠে পানি গড়িয়ে খায়। যতোই পা টিপে টিপে সে উঠুক না কেন, শুতে গিয়ে দেখে কটমট করে একদৃষ্টিতে তার দিকে ঠিকই তাকিয়ে আছে, মেয়েমানুষের গতরই যার একমাত্র পুঁজিপাট্টা সে বোধহয় এই ধাতুরই হয়। মাঝে মাঝে নেশার ঘোরে বেহুঁশ হয়ে ঘুমোয় ঠিকই, কিন্তু আঁটগাট বেঁধে নেয় তার আগে। শোবার আগে তাকে আচ্ছামতো ঘুমের বড়ি গেলায়। আগে তো রীতিমতো কস্তাকস্তি করে দড়িদড়া দিয়ে বেঁধেই রাখতো; মাথার ভিতরে গুবরে পোকা থাকলেও এমন ছিটেফোটা মায়া-দয়া দেখায়। নুরুদ্দিনের আসলে ঘুম হয় না, সে নিছক ঘাপটি মেরে থাকে।

অগাধ টাকার মানুষ হয়তো ঠিকই; সুখী মানুষের ছাঁটকাটই অন্যরকম। কোথাও একটা আঁচড় নেই, দাগ নেই। নরোম ঘুমের ঘোরে চোখের পাতা গোলাপের পাপড়ি হয়ে আছে।

কতো টাকা খসাবে নুরুদ্দিন! একশো! দু'শো! কোন মেয়েমানুষের কাছে যাবে! কতোরাত পর্যন্ত জুয়া খেলবে! মদ আর জুয়া তো তার নিত্যসঙ্গী, রোজগারের টাকাটা ফুঁকতে যতোক্ষণ লাগে, এইমাত্র।

ভেতরটা রোগে থুকথুকে। রোগে রোগে দেহের কাট বেরিয়ে পড়েছে চিকিৎসার কড়ি জোটে না, তলা খাঁকতি লেগেই আছে। পোকাপড়া শরীরের দিকে নজর দিলেও না হয় একটা কথা ছিলো। বিশ-পঞ্চাশেই যার দু'টো শিঙ গজায় হুট করে দু'একশো টাকা হাতে পেলে সে তো দিশাহারা হবেই। কেবল ট্যাঁক ভারী করতে যতক্ষণ অমনি দু'খানা পাখা গজালো। টাকা-পয়সা যাদের হাতের ময়লা, সেই সব মহারথীদের পায়ের ধুলোকে ভেতরে ভেতরে রিজিয়া ভয়ই পায়, জানে কপালের খারাবি তাতে আরো বাড়ে।

এক্‌টা হাই তুললো রিজিয়া। তার শরীর বিশ্রাম চায়। সাত সকালে তাকে দিয়ে গুচ্ছের কাপড় কাচিয়ে নিয়েছে বাড়িঅলি, এমন প্রায়ই কাচতে হয়। বাড়িঅলি– অর্থাৎ বড়জন, নেহাৎই শহুরে; রিজিয়া বনবাদাড় চষা গাঁ-গেরামের মেয়ে, শক্ত-সামর্থ তার দেহের বাঁধুনি, সুতরাং ও তরফের ভারী ভারী কাজে প্রায়ই তাকে হাত লাগাতে হয়। কাপড় কাচতে কাচতে দু'চোখ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিলো আজ, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিলো, পেটে খিল লেগেছিলো।

নুরুদ্দিনকে বলেছিলো, 'তুমি বাড়ি বদলাও!'

বেগার খাটুনির ব্যাপারে অখুশি নুরুদ্দিন দাঁতে দাঁত চেপে বিড়বিড় করে কলমা পড়ার মতো গাল পাড়লেও তেড়ে উঠেছিলো, 'খেলা কথা আর কি!'

অঘোরে ঘুমোচ্ছেন মতলুব সাহেব। ঘাড়ের কোল ঘামে চুবচুব করছে। একটা হাতপাখা টেনে নিয়ে নাড়তে থাকে রিজিয়া। এক একটা কাস্টমার যখন জন্তু-

www.nagorikpathagar.org

জানোয়ারের মতো হামলে পড়ে দলদলে আদেখলেপনায় মেতে ওঠে, তখন রাগে-দুঃখে রি রি করে জ্বলতে তাকে তার সর্বাঙ্গ। মনে মনে সে গাল পাড়তে থাকে, 'নুরুব্যাটা তোর সর্বনাশ হবে, ঠাডা পড়বে তোর মাথায়, নুরুব্যাটা কুষ্ঠ রোগে গলে গলে খসে খসে তুই মরবি, তোর দুঃখে শিয়াল-কুকুর কাঁদবে– '

তবু ভালো, এখনো পর্যন্ত এ মানুষটিকে নিয়ে তাকে এ ধরনের জটিল ও কুটিল কোনো সমস্যায় জর্জরিত হতে হয়নি, যদিও নিশ্চিত করে বলতে পারে না এই মানুষটির গুপ্ত লালসা ভয়ংকর কোনো রূপ নেবে কিনা, কিংবা তার আবেগপ্রবণতা অন্যান্য দু'দশজনের মতো পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার খাতে প্রবলভাবে বয়ে যাবে কিনা।

একফাঁকে পিটির পিটির করে দু'চার ফোঁটা বৃষ্টি হয়ে গেল।

বাড়িওয়ালার বড়তরফ ছাতের শুকনো কাপড় ভিজে যাওয়ায় চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। ছোটো তরফের গলাও শুনতে পেল রিজিয়া; ছোটোজনের চিঁ চিঁ গলা, মনেই হয় না সে কারো জন্য উদ্ধার করছে।

'ফিরলো?' হঠাৎ চোখ মেলে তাকালেন মতলুব সাহেব; তাঁর চোখের দৃষ্টি স্থির শান্ত।

'না– '

চোখ থেকে চশমা খুলে বালিশের পাশে রেখে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুলেন এবার মতলুব সাহেব।

এতো দেরি হচ্ছে কেন নুরুদ্দিনের, ধীরে ধীরে শঙ্কিত হয়ে পড়ে রিজিয়া, ঢেঁকির পাড় পড়তে থাকে বুকের ভেতর। এতোক্ষণ ঠিকমতো খেয়ালই ছিলো না নুরুদ্দিনের ব্যাপারটা। আহ্লাদে আটখানা হয়ে ওপরে যতোই তোষামুদে হাসি হাসুক না কেন, এই নুরুদ্দিন লোকটা কম একরোখা আর দুঃসাহসী নয়, সে সব পারে; জোচ্চুরি-বাটপাড়ি-ছিনতাই মজ্জায় মজ্জায় রপ্ত করে নিয়েছে সে। নানান উৎকল্পনা বুজকুড়ি তোলে রিজিয়ার মাথায়, বহু আগেই তার ফেরার কথা, সন্দেহ নেই কিছু একটা ঘটিয়েছে সে। ঝাড়া দু'ঘণ্টা সে বাইরে, আকাম-কুকামে বসে না গেলে বহু আগেই ফেরার কথা।

প্রথম প্রথম, অর্থাৎ বিয়ের পর পরই তাকে হোটেলে রেখে আসতো নুরুদ্দিন। মালকড়ি হাতাতে যতোক্ষণ লাগে ততোক্ষণই, তারপরই ভোঁ হয়ে যেতো সে সব সময়। হোটেলে খেপ মারার ব্যাপারটা রিজিয়ার কাছে ছিলো রীতিমতো ভীতিপ্রদ। তাকে রাজি করানো খুব সহজ ব্যাপার ছিলো না। হোটেলের নাম শুনলেই তার হাত-পা পড়ে যায় অজানা আশঙ্কায়; অতীন্দ্রিয় আতঙ্কে তিরতির করে কাঁপতে থাকে ভিতর-বাহির। হোটেলের খেপে বিস্তর পয়সা, পীড়াপীড়ির আর অন্ত থাকতো না, শেষ পর্যন্ত খেপে উঠতো নুরুদ্দিন, শুরু হতো টানা-হ্যাঁচড়া, মারধর, অত্যাচার। কিন্তু ঝুলোঝুলি যতোই করুক খুব সহজে সে কখনোই পা বাড়ায়নি, রাজি হয়নি,

www.nagorikpathagar.org

মার খেয়েছে আর ঘন্টার পর ঘন্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থেকেছে গোঁজ হয়ে। হোটেলের কাস্টমারদের কাছে মেয়েমানুষের শরীর নিছক প্যাচপেচে কাদা, হাঁটকানো চটকানোর ধরনটাই সেখানে অন্যরকম। একবার এক ছাত্র হাত মুচড়ে দিয়ে গায়ের জোরে মদ গিলিয়েছিলো তাকে। হোটেলের মেঝেয় সারারাত বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলো সে। দেহে গুচ্ছের অত্যাচারের চিহ্ন নিয়ে টলতে টলতে কোনোমতে নুরুদ্দিনের সঙ্গে নিজেদের আস্তানায় ফিরেছিলো পরদিন; বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেনি প্রায় হপ্তাখানেক।

বিস্ফোরকের মতো সেইসব চিন্তা ভর করে এখন, ঘেমে ওঠে রিজিয়া। দপদপ করতে থাকে মাথা।

একবার এক ঘোরতর মাতাল খাটের ছতরির সঙ্গে তার দু'হাত বেঁধে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত দাঁড় করিয়ে রেখেছিলো নিজের কূট অভিসন্ধি চরিতার্থ করবার জন্যে। টান ধরে গিয়েছিলো শিরায়, অথচ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেনি সেসব নুরুদ্দিন। ট্যাক ভরতে যতোক্ষণ, তারপর তার আর কোনো দায়িত্ব নেই। রাত জেগে কে পাহারা দিতে যাবে তাকে। এইভাবে দিনের পর দিন নুরুদ্দিন তাকে এর-তার মুখে তুলে দিয়ে নিজের ধান্ধায় সরে পড়েছে একদিকে, নির্বোধ অসহায়তার কাছে শুধু মাথা কুটতে হয়েছে তাকে।

'ঘরে সিগ্রেট আছে?'

'না?' ঘড়ঘড়ে গলায় উত্তর দেয় রিজিয়া।

একটা হাত তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে মতলুব সাহেব বললেন, 'আঙুলগুলো ফোটাও দেখি– '

মতলুব সাহেবের চেহারায় চাপা অসন্তোষের চিহ্ন খুঁজতে চেষ্টা করে রিজিয়া। রাগে গা চিড়চিড় করতে থাকে তার, নুরুদ্দিনটা একটা মানুষই নয়।

'কতো দিয়েছিলেন আপনি ওর হাতে?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে রিজিয়া।

'কেন বলো তো?' দীর্ঘ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকালেন মতলুব সাহেব, এই সময় তাঁর পুরু ঠোঁটের কোলে সাহসী বিদ্যুৎ খেলে যায়।

'এমনিই।'

'টাকার জন্যে আমার চিন্তা নেই, এই রকমই যে একটা কিছু হবে, সে আমি আগে থেকেই জানতাম। আমার সময়টা খুব খারাপ যাচ্ছে কিছুদিন যাবৎ। চতুর্দিক থেকে মার খাচ্ছি– '

হয়তো তাসের আড্ডায় বসে গিয়েছে হাড়-হাভাতেটা, দ্রুত রিজিয়ার মনে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়, এদিকে বাঘের মুখে ফেলে গিয়েছে তাকে, ঠাডা পড়ে না কেন ছাইকপালেটার মাথায়, হাড়ে তার বাতাস লাগতো। মতলুব সাহেবের হাতের আঙুল ফোটাতে ফোটাতে মর্মে মরে যেতে থাকে রিজিয়া।

'আসলে সময় কাটানো একটা বিরাট সমস্যা, বুঝলে রিজি!'

www.nagorikpathagar.org

তারপর হাই তুলে মতলুব সাহেব বললেন, 'তুমি বোধহয় ভয় পাচ্ছো? কাজ আর কাজ, চারদিক থেকে মার খাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু কাজের কোনো কমতি নেই। দারুণ হাঁপিয়ে পড়েছি, প্রচুর বিশ্রাম দরকার আমার– '

রিজিয়া জানে এসব কথার কোনো উত্তর হয় না।

'বেঁচে থাকাটা খুব কঠিন। খুবই কঠিন। সকলের জন্যেই। ধরো তোমার নিজের কথাই, কতোদিন ঘর করছো নুরুদ্দিনের?'

'বছরখানেক হবে– '

'বছরখানেক। অথচ তার আগে তোমরা কেউ কাউকে চিনতে না। হয়তো একজনকে বাতিল করে ঘরে তুলেছিলো তোমাকে। দেখবে, তোমার প্রয়োজনও এক সময় ফুরিয়ে যাবে, তখন বুঝবে তুমি নুরুদ্দিনের সঙ্গে ঘর করোনি, শুধু সঙ্গে থেকেছো। জীবনের ধরনটই এই– '

কথাগুলো ফুটন্ত তেলের ছিটের মতো গায়ে জ্বালা ধরালেও মুখ নিচু করে বসে নীরবে পায়ের নখ খুঁটতে থাকে রিজিয়া। আঙুলের নকুনি গুবগুব করে টাটাচ্ছে।

মতলুব সাহেব এবার উপুড় হয়ে শুলেন। বললেন, 'আমি আর একটু ঘুমোবো, তুমি বরং বিশ্রাম নাও।'

টাকাটা হাতে পেয়েই সোজা জুয়ার আড্ডায় ঢুকেছে নুরুদ্দিন আর এতোক্ষণে যে ফতুর হয়ে গিয়েছে– এ ব্যাপারে এখন কোনো সন্দেহ নেই রিজিয়ার। দু'একটা দান কোনোক্রমে যদি বেধেও যায়, তাহলেও ঘরে ফেরার সম্ভাবনা খুব কম, মেয়েমানুষের আস্তানায় মদ ও ফুর্তির ফোয়ারা ছোটাতেই মহাব্যস্ত থাকবে সে।

হাতের ওপর ভর রেখে বিছানা ছেড়ে নিঃশব্দে উঠে আসে রিজিয়া। প্রথম এক গ্লাস পানি খায়, তারপর কি মনে করে ভেঙে ফেলে এলোখোপা। প্রচুর চুল তার মাথায়, গোটা পিঠটাই ঢেকে যায়। চিরুনি নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে সে মাথা ঝাড়ে, তারপর খুব মনোযোগ দিয়ে বিনুনি গাঁথতে থাকে। এক এক লম্পটের হাতে এক একভাবে জব্দ হয় তার চুল। এই একটি জিনিসের প্রতি তার এখনো মায়া রয়ে গিয়েছে। চুল তার নিজের কাছে বড় আদরের। সে অনেকবার চুলে মুখ আড়াল করে প্রাণভরে কেঁদেছে; মা-বাপ ভাই-বোনের স্মৃতির মতোই এই চুলের ভার। রিজিয়া তার জীবনের যাবতীয় সুখকে একটা গোপন ফুলের মতো এই চুলের ভিতর গুঁজে রেখেছে।

কি করবে সে এই মতলুব সাহেবকে নিয়ে!

এখনো পর্যন্ত লোকটার মতিগতি বুঝে উঠতে পারেনি সে। ভেতরে ভেতরে কি মতলব খেলছে রিজিয়া তা আন্দাজ করতে ব্যর্থ হয়।

মানুষটা শোয়াবসার ভাবভঙ্গিতে বিরস নিরাসক্তি ক্রমশই প্রকট হয়ে উঠছে। আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন মতলুব সাহেব, রিজিয়া বুঝতে পারে। অনিশ্চিত আশঙ্কায় নিদারুণ অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছে সে; তার যা স্বভাব।

www.nagorikpathagar.org

বিনুনি গাঁথা শেষ হলে গোড়া ধরে টান মেরে দেখে, চুলের আঁট পরখ করে। এই সময় মায়ের কথা, শৈশবের কথা তার চোখের কোলে চিকচিক করে ওঠে।

বছরদশেক আগে এক মামার সঙ্গে সে গ্রাম থেকে প্রথম ঢাকা শহর দেখতে আসে। বেরুবার আগে চুলে তেল দিয়ে বিনুনি গেঁথে দিয়েছিলো মা। টাঙ্গাইল থেকে বাসে চেপেছিলো তারা। বাসের দুলুনি আর ঝাঁকুনিতে মাঝপথে বমি করে একাকার কাণ্ড বাধিয়ে বসেছিলো সে। ঠিক পাশের লোকটির জামা কাপড় একেবারে ভাসিয়ে দিয়েছিলো।

মামা এবং বাসযাত্রীদের অন্যান্য দু'একজন খেপে উঠলেও লোকটি তাকে কিছু বলেনি। পকেট থেকে রুমাল বের করে তাকে দিয়েছিলো মুখ মুছতে আর নিজে বাস থামিয়ে রাস্তার ধারের একটা দোকান থেকে পানি নিয়ে জামার ঝুল ধুয়েছিলো। বাস ছাড়ার পর লেবুর ভুরভুরে গন্ধমাখা একমুঠো টক লজেন্স তার হাতে গুঁজে দিয়ে হেসেছিলো লোকটি।

সে-ই প্রথম, তারপর নুরুদ্দিনের বৌ হয়ে দ্বিতীয়বার তার ঢাকায় আসা, কোনোদিন ভাবেনি এই ঢাকা শহরই তার কাল হবে।

শহর দেখে গ্রামের বাড়িতে ফেরার পর বহুবার সে বাসের সেই লোকটির কথা মনে করেছে। তার সমস্ত কৈশোর অপরিসীম কৃতজ্ঞতায় ভরে থেকেছে; এক অচেনা কোমল অস্পষ্ট বেদনা দিনের পর দিন তিল তিল অনুভূতিকে প্রগাঢ়ভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

একের পর এক সমবয়েসী মেয়েদের বিয়েশাদি হয়েছে, দল বেঁধে জামাই দেখে বেড়ানো একটা রেওয়াজই ছিলো; কিন্তু তাদের কাউকেই কোনোদিন পছন্দ হয়নি রিজিয়ার।

বয়েস যতো বেড়েছে আবেগও ততো প্রবল হয়েছে। সে কখনো ভারমুক্ত হতে পারেনি। গজালের মতো বুকে বেঁধা এক যন্ত্রণা রহস্যজনক বাঁধনে তাকে বেঁধে রেখেছে। সেই সব ভাবালুতার নির্দিষ্ট কোনো চরিত্র ছিলো কি-না রিজিয়া এখনো তা স্পষ্ট করে জানে না, কিন্তু নিজের ভেতরে সে যে নির্বিষ শান্ত জগৎ তৈরি করেছিলো সেখানে তার পরম নির্ভরযোগ্য আশ্রয় ছিলো, একথা সত্যি।

পোকাপুকি খোঁটা শেষ করে দু'একটি বুড়ো মুরগি যখন এরন্ড গাছের গোড়ায় বসে ঝিমাতো, কিংবা গা জড়াজড়ি করে দাঁড়ানো সুপারিবনের দীর্ঘ ছায়া প্রসারিত হতে হতে উঠোনের গোড়ার ছ্যাৎলাধরা চাইতলায় এসে পৌছাতো তখন অকারণে তার মন হুহু করে উঠতো। তাদের চালাঘরের পিছনে হাজামজা ডোবার কোল ঘেঁষে ছিলো কলাগাছের পুরনো ঝাড়, সেখানে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পা ছড়িয়ে সে বসে থাকতো; নিস্তব্ধতার একেবারে গভীরতম প্রদেশে গাল পেতে শুয়ে তাকে যে স্বপ্ন, সেই স্বপ্নালোকই ছিলো তার চারণভূমি। স্বপ্নের মায়াময় আচ্ছাদন সরিয়ে বারবার সে কেবল একটি মানুষের

www.nagorikpathagar.org

মুখই দেখতে পেয়েছে– শান্ত, পরম আত্মস্থিত সে মুখ; দিনের পর দিন এইভাবে সে লুকোচুরি খেলেছে নিজের সঙ্গে।

একমাথা চুল,ধবধবে রঙ, রোমশ পুরু কবজি, ঘড়ির কালো চামড়া, একে একে অনেক খুঁটিনাটিই মনে পড়ে যায় রিজিয়ার। মর্মরধ্বনি জেগে ওঠে বুকের গভীরে, বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো সে চমকে ওঠে। প্রবল অনুভূতি নিয়ে বিভোর মানুষটিকে দু'চোখ ভরে দেখতে থাকে সে; দিব্য সঙ্গতি অমোঘভাবে তাকে টেনে নিয়ে যায়। অন্তরের পাঁকে যে আতঙ্ক এতোক্ষণ তাকে ক্রমাগত ছোবল মেরেছে মুহূর্তে তা রূপ পরিগ্রহ করে; তুমুল রক্তোচ্ছ্বাসের ছোপ ধরে তার চোখমুখে।

জীবনে এই প্রথম অনাস্বাদিত রোমাঞ্চে বিহ্বল আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ে রিজিয়া। যেন বা দমকা বাতাসে হুটপাট করে খুলে যায় দরোজা জানালার সব কপাট, উদ্‌গত আবেগে নাবাল ভালোবাসায় এবং অবিরল অনুকম্পায় প্লাবিত হয়ে যায় তার অন্ত-রিন্দ্রিয়; জীবনে এই প্রথম আঁচ লাগে তার দেহে, প্রকৃত পাপের অদম্য আকর্ষণে দিশাহারা হয়ে পড়ে সে।

রিজিয়া বিছানার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। পটাপট জামার বোতাম খুলে রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় কাঠের পুতুলের মতো একজোড়া পা ঠিক সেইখানে টেনে নেয়– যেখানে তার স্বপ্নাচ্ছন্ন বিমুগ্ধ কৈশোর আজ পর্যন্ত আলুলায়িত হয়ে পড়ে আছে, সেই বুকের গভীরতম স্পন্দনে।

ঘুম ভেঙে যায় মতলুব সাহেবের।

চোখ লগড়ে স্থির দৃষ্টিতে ছাতের দিকে তাকিয়ে থাকেন কিছুক্ষণ,তারপর তাঁর দৃষ্টি পিছলে পিছলে নামতে থাকে পায়ের দিকে; যুগপৎ বিস্ময় ও বিরক্তি তাঁর চোখে পরস্পরের সঙ্গে দরকষাকষি করতে থাকে। এক সময় ধীরে ধীরে পা টেনে নেন তিনি। উঠে বসেন।

পকেট থেকে রুমাল বের করে নতমুখে অনেকক্ষণ ধরে চশমার কাচ মুছলেন মতলুব সাহেব, তারপর অন্তর্ভেদী দীর্ঘ দৃষ্টিপাতে বিদ্ধ করলেন বিব্রত রিজিয়াকে, যেন নিদরুণ হেলাফেলায় রিজিয়ার হাতে মার খেয়েছে তাঁর প্রকাণ্ড ব্যক্তিত্ব, তাঁর আভিজাত্যবোধকে নির্বোধের মতো তছনছ করে দিয়েছে রিজিয়া 'দেখছি ট্রেনিংটা ভালোই দিয়েছে নুরুদ্দিন– ' ভ্রূ কুঁচকে হঠাৎ মতলুব সাহেব হেসে ওঠেন, 'বুঝি সবই, কিন্তু এ সবের কোনো প্রয়োজন ছিলো না। তুমি মিথ্যেই ভয় পাচ্ছ রিজিয়া, ভাবছো তোমার ওপর আমি শোধ তুলবো, ছি ছি!'

শত চেষ্টা করেও উত্তর দিতে পারে না রিজিয়া, মতলুব সাহেবের সামনে কুঁকড়ে এতোটুকু হয়ে যায় সে; সে জানে তার অস্ফুট আর্তনাদ এই মানুষটির কানে কিছুতেই পৌঁছাবে না।

'আমার কোনো আক্ষেপ নেই!' একটু থেমে তিনি আবার বললেন, 'মন্দ কি, বেশ আরামেই তো কাটানো গেল সময়টা। বুঝলে রিজিয়া, খুব বেশি কোথাও আমি

www.nagorikpathagar.org

আশা করি না কখনো, এমনকি বন্ধু-বান্ধব ভাই ব্রাদার স্ত্রীর কাছেও নয়। এখানেও তাই। কি এমন ক্ষতি হয়েছে!' রিজিয়ার মনে হলো একটা চলন্ত বাস থেকে সবলে গলাধাক্কা দিয়ে কেউ তাকে জনহীন রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছে, তার চোখের সামনে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটা স্বপ্নের বাস ক্রমশ বিন্দু বিন্দু হয়ে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

প্রথমে রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেন মতলুব সাহেব, হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে পকেট থেকে নোটের তাড়া বের করলেন, কয়েকটা গুঁজে দিলেন দ্রুত তার হাতে, বললেন, 'এগুলো রাখো! এবার উঠতে হবে আমাকে। সন্ধ্যার আগেই কাজ সারতে হবে অনেকগুলো– '

বহু কষ্টে সাহস সঞ্চয় করে শেষ পর্যন্ত রিজিয়া বলেই ফেললো, 'বলছিলাম আরো কিছুক্ষণ যদি থেকে যেতেন'

'অসম্ভব! আজ আর হাতে একদম সময় নেই।'

হুড়মুড়িয়ে একটা কাজ করে বসলো রিজিয়া, হাত চেপে ধরলো সে মতলুব সাহেবের। বললে, 'কথা দিন, অন্তত আর একদিন এখানে আসবেন!'

রিজিয়ার অনুনয় অশ্রুসিক্ত ছিলো; কিন্তু মতলুব সাহেবের ঘড়ি এই মুহূর্তে কোনো কিছুই গ্রাহ্যের মধ্যে আনতে নারাজ বেরুবার উদ্যোগ নিয়ে তিনি শুধু আলগোছে বললেন, 'আচ্ছা আচ্ছা, সে দেখা যাবে'

www.nagorikpathagar.org

দম্পতি

কোথায় আড়াইশো টাকা আর কোথায় সাতশো, বিশ-পঞ্চাশ নয় একেবারে সাড়ে চারশো টাকার তুড়ি লাফ; গবগবে ম্যারাইদ্দা থেকে একেবারে চাঁচাছোলা ইস্কাটন। জীয়ো বেটা বরকত আলী, জীয়ো– তোমার মতো বন্ধু তাবৎ দুনিয়ায় আর একটিও মিলবে না, এ আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি। ঠেলাগাড়ী টানার মতো এই পিউট্রিড ইস্পাহানির চাকরিতে আর মান খোয়াচ্ছিনে বাপু, এটা নাকি আবার চাকরি, ফুঃ!

বরকত রিং করেছে তাকে, সুখবর আছে, তার এতোদিনের অক্লান্ত চেষ্টা সফল হয়েছে। বললে, 'বিশ্বাস হয় এখন, তোমার অপরাধকে আমি কতো সহজে নিয়েছিলাম! তুমি তো প্রতিজ্ঞা করে বসেছিলে যে বিশ্বাসই করবে না এ ব্যাপারে আমার চেষ্টার কোনো ত্রুটি নেই। নাও, এবারে হেসে উড়িয়ে দাও দিকি– '

না হে বরকত, আর হেসে উড়িয়ে দিচ্ছি না, জব্বোর ভুল হয়ে গেছে বাপ্। এখন আমার মুখে এই তালাচাবি, টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নয়। বরকত কী-যে বলতে ইচ্ছে করছে! বরকত তুমি একটা জ্যান্ত জিনিয়াস, তুমি একটা হটেনটট, তুমি একটা পোয়েট, ফিলসফার, তুমি সব, তোমাকে কেন্দ্র করেই এই জং ধরা ছ্যাকড়া মার্কা গাব্বুস পৃথিবী পড়ি কি মরি করতে করতে কোনোমতে লাট্টুর মতো ঘুরছে।

ওপার থেকে হেসে উঠেছে বরকত। বলেছে, 'রাখছি, দেখা হবে।'

অতএব হে ইস্পাহানীর চাকরি, হেথা নয় অন্য কোনোখানে, ওগো আমার রোগা পটকা ডিপার্টমেন্ট, আমি চললাম, তুমি বাছা হাপুস নয়নে কাঁদো, আমি চললাম।

চললাম, কিন্তু কেন? জিজ্ঞেস করতে পারবে না একবার? এখন যদি আমি এখানে থাকি বহুত বহুত লোকসান হয়ে যাবে এই ছ্যাঁদা কোম্পানীর, বুঝলে চাঁদ। এই যে দশখানা টেবিল, পঁচিশখানা চেয়ার আর স্টীল আলমারি, সব চুরমার হয়ে যাবে আমার উল্লম্ফন নৃত্যে। এখন আমি উদয় শংকরের ঠাকুর্দা, গোপীনাথ কঙ্কামণির বাবা, হাঃ হাঃ! অতএব হে ছাপোষা পিলেরুগী অপিস, এ শর্মা দেখতে পাচ্ছো না, তুমি মাতৃহারা এঁড়ে বাছুরের মতো বাঁ বাঁ করে কাঁদো, আমি চলিলাম–

www.nagorikpathagar.org

রাস্তায় নেমে জাহিদ হাঁকাহাঁকি শুরু করলো। রিকসা ওহে রিকসা, এই রিকসার ব্যাটা রিকসা, হারিয়াপ হারিয়াপ হারিয়াপ

একটা রিকসায় চড়ে আরাম করে গা ছেড়ে দিলো সে। 'ওগো বুড়ো মিয়া, একটু জোরে চালাও। তোমার পঙ্খীরাজ জোরে চালাও। যে রকম চালাচ্ছ তাতে কেয়ামতের আগে পৌঁছুতে পারবো বলে মনে হয় না– '

প্রতিকূলে তীব্র বাতাস ছেড়েছে। আকাশে হু হু করে মেঘ জমছে, চতুর্দিক দেখতে না দেখতে নিথর হয়ে এলো। শহরের রাস্তা-ঘাট দোকান-পাট সব ঘন ছায়ায় ধোয়া। প্যাডল এর উপর টান হয়ে দাঁড়িয়ে চাপ দিতে হচ্ছে বলে পায়ের শিরাগুলো কেঁচোর মতো ফুলে উঠেছে রিকসাঅলার।

'এই যে চাচামিয়া, তোমার তিন চাক্কার দোহাই, একটু জোরে চালাও– '

'ক্যামনে জোরে চালাই কন্, দ্যাহেন না তুফান ছাড়ছে– '

তা বটে তা বটে! বজ্জাতি স্রেফ বজ্জাতি! ইশ্, আকাশটা একেবারে কালো হয়ে নুয়ে পড়েছে, ওড়া চিলগুলো দেখে মনে হচ্ছে আল্লামিয়া একখানা প্রেম-পত্র ছিঁড়ে কুটি কুটি করে আকাশে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে; তোফা তোফা, এতোদিনে আকাশের লজ্জা ভাঙছে!

বাবা বরকত আলী তুমি কিসস্যু ভেবো না বাপধন, চাকরিটি আগে বগলে পুরে নিই, তারপর শুভদিন দেখে একচোট খাওয়াবো তোমাকে, দেখি বাছাধন কতো সাঁটতে পারো। এইসা গেলান গেলাবো, যে, তোমার ঐ বিক্রমপুরী পিলে ফটাস করে ফেটে বেরিয়ে যাবে, হাঃ হাঃ হাঃ-

বরকত আলীর মতো বন্ধু আর হবে না, যাকে বলে একেবারে আঁটি পর্যন্ত সাঁচ্চা! অবিশ্যি আমি নিজেও কম যাই না বাপু, নিজে ভালো তো জগতের ছুঁচো ইঁদুর গাঁধিপোকা চোর-ছ্যাঁচড় বাটপাড় হিজড়ে সব ভালো। আমার ভিতর যদি কিছু না-ই থাকবে, তাহলে বন্ধুর মাথায় চাকরির চিন্তায় শুধু শুধু আকাশ ভেঙে পড়বে কেন! খেলা আর কি! আমরা হলাম সংসারের গৌরব, দেশের সৌরভ, আমরা হলাম যুগের দান, শতাব্দীর শিশু, মার কৈলাস! বেঁচে থাকো আমার ক্যান্সার-ব্লাডপ্রেসারে ভোগা ঢোস্কা পৃথিবী

একেবারে সাতশো টাকা। কম কথা নয় হে, কম কথা না! খানেওলা বলতে আমরা দু'জন, তাও প্রাণেশ্বরী আমার এক্কেবারে চড়ুই পাখিটি, শালার অতো রাখবো কোথায়? হাঃ হাঃ বিলিয়ে দেবো, তবু ঐ চাকরিটি আমার চাই। বাবা এস্পাহানী, লালবাতি জ্বালার দিন ওই এসে গেল, আমি যে দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি চাঁদ, কোম্পানী ফেল মারলো বলে। ওহো, পাশের ফ্ল্যাটের ওই অক্সফোর্ড ফেরতা শিয়াল পণ্ডিতটাকে একটা শিক্ষা দিতে চাই। এ শর্মাকে এখনো চেনোনি চাঁদ, হোথা মুখ একেবারে থোতা করে দেবো না! দেখি বাছাধন কে কার বউকে ক'টা শাড়ি পরাবার ক্ষমতা রাখে শীলাকে কাপড়ের গাঁটের উপর বসিয়ে রাখবো, খেলা পেয়েছ, চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি দুনিয়াকে, হায় কোঈ লড়নেওয়ালা তো এসে যাও, পাকিটে পোরা আছে কতো রথচাইল্ড,ফোর্ডঃ বোম ফেলাট্!

www.nagorikpathagar.org

'হৈ মানু চক্ষে দ্যাহো না– '

ডান হাত বাড়িয়ে অন্যমনস্ক পথচারীকে ধাক্কা দেয় রিকসাওয়ালা। জাহিদ সুর মিলিয়ে বললে, 'ওগুলো মানুষ নয় চাচামিয়া, ফানুস! শালার গোঁবরের তাল, পারলে না গর্দভটার পায়ের উপর দিয়ে চালিয়ে দিতে! ফিলোসফার, বোম ফেলাট, হাঃ হাঃ–

এই দেখো সাজ্জাদের সেই পঞ্চাশটি টাকা এখনো শোধ দেওয়া হয়নি, প্রেসটিজ-ট্রেসটিজ সব ধোলাই খালে গেল রে, ছি ছি, সামনের মাসে মাইনেটি পেলে হয়, সোজা গিয়ে নাকের উপর ঝনাৎ করে টাকাটা ফেলে দেবো, বলবো বেশি দেবো না– কি কিছু, সুদ হিসেবে তোমার কিছু বেশি পাওয়া উচিত, স্কাউন্ড্রেল! পুয়োর ফেলা, পিগমী, বাঁটুল, হেড়ে মাথা! হতভাগা, এখানে তুমি মেড়োদের মতো ঘাড় ছেঁটে তিব্বত ব্যুকে পাউডারে সাদা করে রাখো, খেঁটো চাষা, সামান্য ভদ্রতাটুকু এখনো শেখোনি, না হয় নক্‌লিবাজী চালিয়ে বাপ-দাদার পুণ্যে এক একটা পাশ দিয়েছ, শিখেছ কচু, আজকাল গাধা-ঘোড়াই তো সব নেকা-পড়া শিখছে, ফটাফট পাশ দিচ্ছে। তা বাপু খুব তো এম এ পাশ দিয়েছ, একদিকে তুমি আর একদিকে এই ফিনফিনে শর্মা,যিনি দু'বছর মাইনের টাকা সিগ্রেট ফুকে উড়িয়ে দিয়ে বি-এ পরীক্ষা দিতে পারেননি! লাইফ বাবা, এরই না লাইফ! তা এসো দেখি তোমার জ্ঞানের বহর! উড়িয়ে দেবো না, জেনারেল নালিজে টাইট আছি বাস! পটকা ভার্জিল বলো কেশো রুগী লরেন্স বলো সব ভেজে খেয়েছি! বলো দেখি বাপধন কুফুর পিরামিড গড়তে ক'বছর লেগেছিল? হে হে, এ আর তোমার দশ ইঞ্চি ইটের উপর বসে পুঁয়ে নাপিতের কাছে ঘাড় চাঁচা নয়, বাইশ বছর– বুঝলে চাঁদ, বাইশ বছর, এক লক্ষ ক্রীতদাস বাইশ বছর ধরে খেটেছে, বিশ্বাস না হয় হিরোডোটাস পড়ো। বাছা আবার আমার গপ্‌পো লেখেন, মেরেছে আর কি! এ যে বাবা ছাহিত্য ছাহিত্য খেলা। হেগেল মার্ক্স এলিস-ফ্রয়েড ফামিংসপাউণ্ড ভ্যানগগ-পিকাসো, এই কালকের ছুঁড়ি ফ্রাঁসোয়া সাগা, এই শর্মা একটু আধটু নাড়াচাড়া করেছে এইসব। আমার কাছে কাপ্ গপ্ মারতে এসো না, বোম ফেলাট্ হয়ে যাবে, দোহাই তোমার বাপ্।

কিন্তু ইল্লতটার টাকা সামনের মাসে যে করেই হোক চুকিয়ে দিতে হবে। বুড়বক, উজবুক, পিলেরুগী, ঘাড়খাটো, হতভাগায় ঠ্যাংজোড়া যেন ধনুক, হে হে! ওহে মন, তুমি যেন আবার শরৎ চাটুজ্জের জীবনের মতো ইচ্ছে করে ভুলে বসো না, ও দেনাটা মিটিয়ে ফেলতে না পারলে আমার স্বস্তি নেই। শালা এখনো ভদ্রভাবে কথা বলতে শেখেনি, গাণ্ডু

'ও বুড়োমিয়া, এ কি বায়নাক্কা শুরু করলে? জোরে চালাও বাবা, একটু জোরে চালাও বাবা একটু জোরে চালাও, না হয় তিন নম্বর বিবির পানদোক্তার জন্যে একটা সিকি বেশি নিও। এই যে বাবা বুড়োমিয়া, দোহাই তোমার তিন চাক্কার, অমন কেশোরুগীর মতো চালিয়ো না'

'ইনসাফ কইরা কথা কয়েন সাব, দ্যাহেন না তুফান অইতাছে, রিসকার লগে তো আর লারাই করবার পারি না। পড়ছি হালায় আজুইয়া সোয়ারীর পাল্লায়– '

www.nagorikpathagar.org

বটে বটে, তা বাপু আমার জন্যে না হয় একটু লড়াই করলে। চাষা, চাষা, দিলে সব থ্রিলটা মার্ডার করে। চাচামিয়া, উপায় থাকলে তোমার ওই সিঙাড়ার মতো নাকটি আমি থেঁৎলে দিতাম, কিন্তু উপায় নাই, ওদিকে শীলাকে খবরটা দিতে হবে কি? এখন? চিনলে না প্রাণেশ্বরী, এখনো চিনলে না তোমার হেদয় র‍্যাংকের জিনিয়াস ফিলিয়াস ফগ। তা বলো, যেতে চাও কোথায়? কক্সবাজার, আজমীর শরিফ, হিমালয় পর্বত, যেখানে খুশি। শুধু একটা সম্মতি-ব্যস্ আফ্রিকার জঙ্গলে বলো, আসামে বলো, আটলান্টিক ভিসুভিয়স কি ফুজিয়ামার ফোঁকরে বলো, যেখানে ইচ্ছে, এ শর্মা রাজি আছে! তোমার ওই চড়ুই পাখির শরীর সাদা তুষারে ঢেকে দিতে চাই, পড়েছ কার পাল্লায় তা তো আর জানো না, চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি, বেতো দুনিয়াকে, চলে এসো, কামেনফাইন, কামেনফাইট, টিঁচু টিঁচু টিঁচু–

'এই বাহাত্তুরে বুড়ো, খুব হয়েছে বাপ, তোমার তিন চাক্কা থামাও, এই নাও পহা, গুষ্টির পিণ্ডি দেই তোমার রিকসার, তোমার আশায় গা ছেড়ে দিয়ে বসে থাকলে ইহজনমে আর প্রিয়ার মুখ দেখতে হবে না, দূর হও, শালার ফ্যান্টোমাস!'

হু হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া ছুটছে। রাস্তায় নেমে বেশ লাগে জাহিদের। বৃষ্টি আসলেই বা তার কি, না আসলেই বা! আসলে মেঘ থেকে চুঁয়ে পড়া এই কালো ছায়াগুলো অন্তত আজকের জন্যে প্রয়োজনীয় ছিল। শরীর-মন জুড়িয়ে যায়। গান গাইতে ইচ্ছে করে গলা ছেড়ে।

ডালমুটের দোকানে ঢুকলে জাহিদ। ডালমুট ও প্যাস্ট্রি কিনলো। গেল আর এক দোকানে, কিনলো, কিনলো চকলেট হরলিক্স, তারপর চেপে বসলো বেবী-ট্যাক্সিতে। ঝোড়ো হাওয়া চিরে তীরের মতো ছুটতে ছুটতে জাহিদের মনে হলো এইমাত্র সে পাখি হয়ে গেছে, বাজপাখি; পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে হাওয়া কেটে সে উড়ে চলেছে। কিন্তু কার জন্যে? প্রাণেশ্বরীর জন্যে। প্রাণেশ্বরী কে? শীলা শীলা! দেখো শীলা, এই বলে রাখলাম, তোমার টুনটুনি বুলবুলি মুনিয়া পাখি হয়ে থাকা চলবে না, হ্যাঁ চলবে না, এবং আমি আরো বলছি– আমি তোমার কীর্তিমান পরমপুণ্য প্রণয়পবিত্র হৃদয়বল্লভ জহিদ বলছি, দিনরাত প্যাঁচার মতো মুখ গোমড়া করে বসে থাকা চলবে না। তোমাকে ম্যারাথন রেসে ফার্স্ট হতে হবে, হাইজাম্পে রেকর্ড করতে হবে, লম্ফঝম্ফ দিয়ে তৈরি করতে হবে শরীর, শরীর মানে মন, ওম্ শান্তি! সংসারের জন্যে কোনোরকম দুশ্চিন্তা করা আমি বরদাশ্ত করবো না, ক্লীয়ার কাট বলে দিলাম। তুমি যখন খাবে, এইসা ঠেঁসে খাবে যেন চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে। যখন ঘুমুবে আশি ওজনের ভদ্দুরে তাল পিঠে পড়লেও যেন সে ঘুম না ভাঙে। যখন হাসবে তখন মাথার চাঁদিতে ঘরের ছাদ ধসে পড়া চাই। এরই নাম লাইফ! লাইফ চাই লাইফ, পরোয়া করি না দুনিয়ার! তফাৎ যাও

বেশ, বেশ, এই গতিই বুঝি জীবন,আহারে ইস্পাহানী কোম্পানী, বাছা তোমায় এখন আমি করুণা করি, কেমন পুঁইশাকের ডাঁটার মতো তোমার ঠ্যাঙে ল্যাং মেরে কেটে বেরিয়ে যাচ্ছি, বোম ফেলাট্- হাঃ হাঃ, কিন্তু শীলাকে কিভাবে খবরটা

www.nagorikpathagar.org

পরিবেশন করা যায়। সোজাসুজি বললে আর রইল কি! আমরা ভেতো বাঙালী, ফ্যানে-ভাতের কাঙালী, মারপ্যাঁচের কদর বুঝতে গেলে লুঙ্গির গেরো খুলে যায় ফশ্ করে। উচ্ছন্নে গেল জাতটা, উচ্ছন্নে গেল। চুলোয় যাক! প্রথমে বলতে হবে ইস্পাহানীর চাকরি গেল, আহা বেচারী শীলা,কাটা কলাগাছের মতো পড়ে যাবে ধপ করে, হাঃ হাঃ, থ্রিল আছে আজকের খবরে। কিন্তু মক্ষীরাণী একেবারে নার্ভাস। উহ্, শীলা, ইচ্ছে করছে দুমড়ে মুচড়ে তোমাকে গুঁড়ো করে ফেলি। ইচ্ছে করছে আছাড় মারি, কিড়মিড় করে চিবিয়ে খাই। পাজি ছুঁচো, শীলা তুমি এক নম্বরের ছিচকাঁদুনে, বোকা মেয়ে, গবেট গবেট, চড়িয়ে গাল গড়িয়ে দেবো, খেয়ে ফেলবো, হালুম হালুম হালুম। কিন্তু পুরুষ মানুষের এক কথা তোমাকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে, উনিশ থেকে বিশ হলেই কান ছিঁড়ে নেব, চলবে না– অমন রোগা পটকা হয়ে থাকা চলবে না। আমি বলছি না দেহটাকে বোগদাদী গম্বুজের মতো ফাঁপিয়ে তোল, মা জগদম্বা হও, আমার কথা স্বাস্থ্য তোমাকে ভালো করতেই হবে। সিগারেলা, সিগারেলা–

কী আশ্চর্য, শীলা কী করে টের পেল এই অসময়ে আমি অপিসের লেজ ধরে বনবন ঘুরপাক খাইয়ে বাড়িতে আসছি। ওই তো জানালায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এই দিকে চেয়ে, প্রাণেশ্বরীর সঙ্গে আমার আত্মাটা দুধ আর পানির মতো এমনভাবে পাইল হয়ে গেছে যে কোনটা কার এখন আর তা বের করা যাবে না। আল্লামিয়া জাত মিক্সশ্চার বানানেওয়ালা হাঃ হাঃ! ওহো, রোকো বাপু, রোকো, ঠায়রো– দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে যেতে চাও নাকি, দেখছো না উপরে আমার প্রিয়া দাঁড়িয়ে রয়েছে! শীলা, শীলু, শীলাশীলু–

ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে দোতলায় উঠলো জাহিদ, তর সইছে না তার। শীলা দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল। বললে, 'এতো শিগগির?'

'এমনিই এবং এমনিই, ফলে এমনিই, এমনিই

আপাতত এর বেশি বলবার মতো স্থিরতা তার ছিল না। সে ঘাড়গুঁজে সোজা ঘরে ঢুকে জুতো জোড়া চৌকির তলায় চালিয়ে বললে, 'কমরখত্ কাঁহিকা, এতোক্ষণ জব্বোর কামড়ান কামড়েছ, এখন লেজ গুটিয়ে ওইখানে চুপটি করে ঘাপটি মেরে স্পিকটিনট বসে থাকো, টুঁ শব্দটি করেছ কি এইসা প্যাঁদান লাগায় গা– '

শার্টের বোতাম খুলে ঘরের দেয়ালগুলোকে শুনিয়ে সে বললে, 'আঃ!' কিন্তু শীলাটা ও ঘরে ঢুকে করছে কি? এই দেখো পিণ্ডি মারা গেল– সে ছুটে জানালায় এলো, ব্যাটা সটকে পড়েছে, অতোগুলো টাকার সওদাপাতি বেফায়দা ভেসে গেল, প্যাকেটগুলো নামানোই হয়নি। আশ্চর্য জিনিসগুলোর কথা একটুও যদি মনে থাকে! খুব খেল্কি দেখালে বাছাধন, ভেবেছ ওই খাবারটুকু গাপ্ করতে পারলেই মহা লাভ হয়ে যাবে তোমার, সেটি হচ্ছে না চাঁদ, ওই ছাইভস্ম গিলে তোমার পেয়ারের বউ যখন এই সাত হাত নোলা বের করে বসে থাকবে তখন পথ খুঁজে পাবে না বাপ্, ওই নোলা ভরতে গিয়ে হাড়ির হাল হবে তোমার জোচ্চোর কোথাকার, ফুঃ, দেশটা উচ্ছন্নে গেল!

'শীলা!'

www.nagorikpathagar.org

বেশ জোর দিয়েই সে ডাকলো। শীলা নির্বিকার চোখে-মুখে ওর সামনে এসে দাঁড়াল।

'বলি হয়েছে কি? অমন হাড়ির তলার মতো মুখ কেন? মাথা ধরেছে? বাপের বাড়ির কথা মনে পড়েছে?'

শীলা আড়ষ্টভাবে হাসলো! বললে, 'মাথা ধরেনি, তবে ধরবো ধরবো করছে– '

'আমি বলছি আর ধরবে না, আমি চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি।'

'থাক আর চ্যালেঞ্জ দিতে হবে না– '

'দেবো না মানে? একশোবার দেবো, দু'শোবার দেবো, তোমার বাবার কি? জংলী কোথাকার, কিম্ভূতকিমার ভূত কোথাকার– '

'কি বললে?' বাঁ চোখ কুঁচকে শীলা বললে।

জাহিদ ঘুষি পাকিয়ে বললে, 'তোমার বাপকে এই শর্মা থোড়াই পরোয়া করে! তোমার চোদ্দগুষ্ঠীকে এক গুষিতে মাটিতে ফেলে দিতে পারি, তা জানো? ইষ্টুপিট, উল্লুক বাঁদর সিল্কের চাদর, আর এই মুহূর্তে মানে– ' সে রিষ্টওয়াচ দেখে নিয়ে শীলার গলা টিপে ধরে বলল, 'মানে এই ঠিক দু'টো বেজে তিন মিনিট তেত্রিশ সেকেণ্ডের সময় আমি এইভাবে তোমার গলা টিপে মেরে ফেলতে পারি, মেরে ফেলতে পারি, হাম উন্মাদ হায়– '

শীলা আর্তনাদ করে বললে, 'সত্যিই মেরে ফেলবে নাকি, এ রকম করছো কেন, ছেড়ে দাও, দোহাই তোমার মাপ করে দাও– '

'মাপ করে দেবো, মাপ?' শীলার কাঁধ ধরে প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি দিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো জাহিদ, 'খুন করবো, কোনো শালা নেই আমাকে ঠেকাতে পারে, কোনো শালা নেই! আমি মাপ করবো না, কিছুতেই না– '

শীলা কেঁদে ফেললে। বললে, 'তুমি ভুলে যাচ্ছ, তুমি আমাকে কতো ভালোবাসো, আমাকে মেরো না, ওগো আমাকে মেরো না–

আবার তুমুল অট্টহাসিতে ভেঙে পড়লো জাহিদ। শেষে বললে আবার 'ভীতু কোথাকার শীলা সত্যি সত্যিই ভয় পেয়েছিলো। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে সে বললে, 'তুমি নিশ্চয়ই আজ কিছু খেয়েছ– '

'একশোবার খাবো, কি করতে পারো তুমি? তুমি টুনটুনি পাখি, মশা, তুমি বলবার কে?'

'বেশ, আমি ও ঘরে যাচ্ছি– '

'লাট সাহেবের নাত্‌নী, আমার হুকুম ছাড়া এক পা নড়ে দেখো দিকি, ঠ্যাং কুচি করে দেবো না। দেখি কতো সাহস, নড়ো, নড়ে দেখ– '

শীলা স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে, তার হাত-পা সরে না।

'তোমাকে বলতে হবে কেন এমন অসময়ে আমি বাড়ি ফিরলাম! কেন কেন কেন, তোমাকে বলতেই হবে, না বললে ক্যাঁচম্যাচ করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবো, বলো কেন ফিরলাম, বলো, কি এর উদ্দেশ্য– '

www.nagorikpathagar.org

সে শীলার কাঁধ ধরে সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে মদোন্মত্ত সিংহের মতো হুংকার ছাড়ল।

শীলা যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে অসহায়ভাবে বললে, 'আমি জানি না!'

শীলা মেঝের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো, তারপর পায়ের পাতায় মুখ গুঁজে অশ্রুবিগলিত কণ্ঠে বললে, 'আমার মন বলছিলো একথা তুমি জানতে চাইবেই।

ওগো–

জাহিদ টেনে তুললো তাকে, নাক গুঁজে দিল তার বুকের ভিতর, বললে 'সোনামণি আমার, একটু বিশ্রাম করি, মাত্র দু'মিনিট, বড় হাঁপিয়ে পড়েছি– '

শীলা তার মাথায় গাল রাখলো।

একটু পরে বললে, 'এইবার ছাড়ো'

'তার আগে বলো আমাকে একটা লিস্ট দেবে?

'লিস্ট? কিসের লিস্ট?'

'মানে কি কি চাই তোমার– '

'আমার কিছু চাই না– '

সাতশো টাকার একটা চাকরি ঠিক হয়ে গেছে, চাইনা মানে, না চাইলেই হলো, খেলা কথা আর কি। বলো দেখি চাকরিটা কে দিচ্ছে?'

'তুমি বলো– '

'বরকত, বরকত! ইশ, বেচারাকে ওদিন অমন করে আসতে নিষেধ করাটা কিন্তু তোমার বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। ছিঃ ছিঃ, এখন কি ভীষণ খারাপ লাগছে। জানো শীলা, মানুষের ওপর থেকে আচার-ব্যবহার দেখে এই যে আমরা হুট করে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাই, এটা কিন্তু অনেক সময় গর্হিত কাজ। বরকতের যে সব ব্যবহার তোমার ভালো লাগেনি, সুস্থ মাথায় চিন্তা করলে হয়তো তুমি তার অন্য ব্যাখ্যাও দাঁড় করাতে পারতে। আসলে নিজেদের মনেই কিছু কিছু ময়লা জমা থাকে– '

শীলা বললে, 'ওসব কথা থাক!'

জাহিদ আদরে আদরে শীলাকে লণ্ডভণ্ড করে দেয়। মনের সাধ মিটিয়ে খেলা করে।

'রাগ করলে? আমি তোমার কোনো দোষ দেইনি! আসলে অনেক সময় ইচ্ছের বিরুদ্ধে অনেক কিছুই ঘটে যায়– '

শীলা বড় বড় চোখে জাহিদের দিকে তাকাল।

জাহিদ তাকে আবার কাছে টেনে নিল। বললে, 'আজ আমি ভেসে যাচ্ছি আনন্দে, শীলা সাতশো টাকার চাকরি মুখের কথা নয়, আজ শুধু আনন্দ, আজ যা ইচ্ছে তাই করবার, বরকত আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ, তুমি গ্রেটম্যান, তোমার তুলনা নেই– '

জাহিদের বাহুবেষ্টন থেকে ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত করে শীলা, তার চোখ জোড়া শিশিরসিক্ত, অনেক আগেই সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

'কাঁদছো কেন?'

শীলা বললে, 'তোমার কি, আমি কাঁদছি তো তোমার কি– '

তার উত্তরে বিন্দুমাত্র ঝাঁঝ ছিল না, জাহিদের মনে হয় এই দুর্বল মুহূর্তে শীলার কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নেই, সে বললে,'এ যে কী সুখ শীলা, কান্না তো আসবেই, এই দেখো না আনন্দে আমারও কেমন কান্না পাচ্ছে'

শীলা বললে, 'আমাকে কিছুক্ষণ একা থাকতে দাও, দোহাই তোমার, কিছুক্ষণ একা থাকতে দাও– '

শীলা পাশের ঘরে ঢুকে দরোজার ছিটকিনি তুলে দিল। অনেক ডাকাডাকি করলো জাহিদ, কিন্তু কিছুতেই দরোজা খুললো না শীলা, সে বুঝলো কান্নার সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে শীলার, খুব সম্ভব মেঝেয় আছড়ে পড়ে ফুলে ফুলে সে কাঁদছে, তার গলার স্বর বিকৃত।

বন্ধ দরোজার ওপার থেকে বারবার একই কথা বলছে জাহিদ, 'কেন তুমি চাকরি নিতে গেলে, কেন কেন– '

www.nagorikpathagar.org

বেওয়ারিশ লাশ

জামশেদ চৌধুরী ছেলেকে বললেন, 'টিপু যা তো এক দৌড়ে, তরফদারকে ডেকে আন। আমার নাম করে বলবি যেন এক্ষুনি আসে– '

টিপু বললে, 'যদি জিজ্ঞেস করে কেন, কি বলবো?'

'তোর মাথা বলবি, গবেট কোথাকার।' খিচিয়ে উঠে জামশেদ চৌধুরী। বললেন, 'বলবি আমি জানি না।'

টিপু বেরিয়ে যেতেই ডাকলেন ঝুনুকে। বললেন, 'একাডেমিতে যাচ্ছিস নাকি আজ?'

ঝুনু বললে, 'আজ আমাদের পরীক্ষা।'

'কি হবে ওসবে? গানফান না শিখলে কি হয়? সব জিনিসের একটা সময়-অসময় আছে। কোনো দরকার নেই আজ কোথাও বেরুনোর। ঘরে থাক– '

ঝুনু বললে, 'তাই বলে পরীক্ষা দেবো না?'

জামশেদ চৌধুরী ক্ষেপে উঠে বললেন, 'একটা কিছু কাণ্ড না বাঁধিয়ে তোরা ছাড়বি না। এটা গান বাজনার সময়? আজ থেকে ওসব বন্ধ। এসব আমি বরদাস্ত করবো না। বড় বাড় বেড়ে গেছে তোদের– '

মরিয়ম এসে বাগড়া দিলেন। বললেন, 'ওকে নিয়ে আবার টানাহ্যাঁচড়া শুরু করলে কেন? ও যাবে– '

'যাবে না– '

'এতো হুলস্থুল কাণ্ড বাধাচ্ছো কেন? কোনো কিছু ঘটে গেলে ঠেকাতে পারবে তুমি? সে মুরোদ আছে তোমার? ঘরের ভিতর বসে বসে কেবল লেজ নাড়বে! ও যাবে– '

জামশেদ চৌধুরী বললেন, 'আদর দিয়ে দিয়ে তুমি ওদের মাথা নষ্ট করেছ, সব কয়টা বেয়াড়া। আমি কি ওদের মন্দের জন্যে বলছি?'

মরিয়ম বললেন, 'কার না কার একটা লাশ পড়ে আছে, এই নিয়ে ভয়ে তুমি একেবারে দাপাদাপি জুড়ে দিয়েছ। কেন, আশেপাশে আর মানুষজন নেই? সবাই কি তোমার মতো ভয়ে ভিরমি খাচ্চে?

www.nagorikpathagar.org

'একটা কিছু হয়ে গেলে তখন বুঝবে?'

'কপালে থাকলে হবে'– মরিয়ম বললেন, আমরা কোনো সাতেপাঁচে নেই সকলেই জানে। টিপু তো ঘর থেকে বেরই হয় না তোমার ভয়ে। মেয়েটাকেও জুজুবুড়ি বানিয়ে রেখেছ।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই তরফদার এসে হাজির হলেন।

বললেন, 'কি ব্যাপার?'

'শুনেছ ঘটনা?'

'লাশ পড়ে আছে, তাই– ?'

'সকালে উঠে এসে দেখি এই কাণ্ড, ঠিক একেবারে জানালা বরাবর, কি মুশকিল দেখো তো।'

তরফদার বসে এক গ্লাস পানি খেলেন। বললেন 'লাশ যে কার কিছু বোঝা গেল না।

ছোকরা বয়সের গেরিলা টেরিলা একটা হবে, তোমার কি মনে হয়?'

জামশেদ চৌধুরী বললেন, 'এ পাড়ার কোনো ছেলে নিশ্চয়ই?'

'তাইবা কি করে বলি। কেউ তো চিনতে পেরেছে বলে শুনিনি। রহস্যটা তো এখানেই। কোথাকার কে মরে পড়ে রয়েছে এইখানে– '

'আমার মনে হয় এ পাড়ারই কোনো ছেলে, রাত্রে আর্মিরা মেরে গেছে। যাদের ছেলে তারা জেনে শুনে হাত পা গুটিয়ে বসে আছে, ভয়ে ধরা দিচ্ছে না।'

তরফদার বললেন, 'তা হয় না। চোখে দেখে কেউ চুপ করে বসে থাকতে পারে না।

'তোমার হলে পারতে?'

'অবস্থা গতিকে অনেক কিছুই হয়।'

'বাইরের কোনো ছেলে, মারা পড়েছে এখানে।'

জামশেদ চৌধুরী বললেন, 'কি রকম একটা ল্যাঠা দেখো, এখন এই নিয়ে যদি টানাহ্যাঁচড়া শুরু করে তখন কি হবে। ইচ্ছা করলে আমাদের জড়াতেও পারে। আচ্ছা ধরো লাশটা অন্য কোথাও পড়েছিল, রাতের অন্ধকারে টেনে এনে জানালার পাশে রেখে গেছে পাড়ার কোনো শত্রু– '

'তেমন শত্রু কেউ আছে নাকি তোমাদের।'

'থাকলেও থাকতে পারে। ভেতরে ভেতরে কার মনে কি আছে কি করে বলবো বলো। কাউকে আমি তেমন ভালো লোক মনে করি না। বাড়িঘর তুলে বসবাস শুরু করার পর সেই প্রথম দিকে কি আর কম জ্বালান জ্বালিয়েছে। কোনো লোকই এখানকার ভালো নয়, সে তো তুমি নিজেই জানো, তোমার ভোগান্তি তো আর কম হয়নি। এখনো তো কোর্ট কাচারীতে ছুটোছুটি করছো– '

তরফদার বললে, 'সেটা অন্য ব্যাপার। এখন কি করবে ঠিক করেছো।'

'ছেলে-মেয়েদের ঘরের বাইরে যেতে বারণ করে দিয়েছি।'

'এতে কি লাভ?'

www.nagorikpathagar.org

'উটকো ঝককিতে জড়িয়ে পড়তে পারে।'

'তোমার এমন বুদ্ধি। আমি তো কাণ্ডটা দেখেই উল্টো সবাইকে শান্তিনগরে ওদের মামার বাসায় পাঠিয়ে দিয়েছি, এখানে থাকলেই বরং ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারে– '

'কিভাবে?'

'ধরো যদি এই অজুহাতে আর্মিরা এসে হাজির হয়, থানা পুলিশ হয়, তখন?'

'সাক্ষী মানতে চাইলে তো আর না করানো যাবে না। আমি নিজেও অফিসে বেরিয়ে পড়বো কিছুক্ষণের মধ্যে– '

জামশেদ চৌধুরী বললেন, 'বলো তো এখন কি করি? কি ঝামেলায় পড়লাম– '

'থানায় একটা খবর দাও না।'

'তার মানে আরেকটা ফেরে জড়িয়ে পড়া– '

'এখন কি করবে ঠিক করেছো?'

'আমাকে উঠতে হবে– '

'এক কাজ করলে কি হয়? পাড়ার রাজাকার ক্যাম্পের সঙ্গে যোগাযোগ করলে কেমন হয়? কিছু টাকা পয়সা ওদের দিলে ওরা হয়তো লাশটাকে অন্য দিকে সরিয়ে নিতে পারে।'

'তা পারে, তবে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ না করাই ভালো, এক বান্দাও তো ভালো ঘরের কেউ নয়, রাস্তা থেকে কুড়োনো। আমি ওদের দেখলে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিই। সব সময় দেড় হাত দূরে থাকা ভালো।'

জামশেদ চৌধুরীর মনে হলো তরফদার ইচ্ছে করেই ব্যাপারটা তেমন গায়ে মাখতে চাচ্ছে না।

তরফদারকে বিদায় দিয়ে ঘরের ভেতরে গেলেন তিনি।

ঝুনুকে বললেন, 'যা পরীক্ষা দিতে যা, দেরি না করে বেরিয়ে পড়– '

মরিয়ম রেগে গিয়ে বললেন, 'নিজের ঘটে তো আর কিছু নেই, এতোক্ষণ এতো তেড়িবেড়ি করলে কেন?'

টিপুকে পাঠালেন কমলাপুরে ভায়ের বাড়িতে। ঝুনু বেরিয়ে যাওয়ার পর জানালার ফাঁকে একটা চোখ লাগিয়ে বললেন, 'এক কাজ করলে হয় না?'

মরিয়ম বললেন, 'কি?'

'থানায় একটা উড়ো টেলিফোন করলে কি হয়?'

'কেন সোজাসুজিই তো বলে আসতে পারো। পরে যদি ওরা বলে, ঘরের পাশে একটা লাশ আছে, আপনাদের কি উচিত ছিলো না পুলিশে খবর দেওয়ার– '

'তাহলে?'

জামশেদ চৌধুরী বললেন, 'আমার মাথায় কিছু আসে না। আচ্ছা আব্দুল গিয়েও তো এক ফাঁকে লাশটাকে একটু অন্য দিকে সরিয়ে দিতে পারে– '

'তারপর ওকে নিয়ে যদি টানাহ্যাঁচড়া হয়?'

www.nagorikpathagar.org

'ধরো ও চলে গেলো। ঘুরেই আসুক না দেশ থেকে কিছুদিনের জন্যে– '

মরিয়ম বললেন, 'তারপর ঘরের কাজ চলবে কিভাবে। দেশে পাঠাও বললেই তো আর পাঠানো যায় না। অন্য একটা কাজের লোক পাচ্ছো কোথায়।'

জামশেদ চৌধুরী বললেন, 'তোমাদের নিয়েও হয়েছে এক জ্বালা। চাকর-বাকর ছাড়া একটা দিনও তোমাদের চলে না। বিদেশে হলে হাড়ে হাড়ে টের পেতে, কোথায় যেতো এসব বাবুয়ানা– '

একটু পরেই দু'জন খাঁকি পোশাকের রাজাকারকে আসতে দেখা গেল। তারা এসে লাশটাকে উল্টেপাল্টে দেখলো। তারপর কড়া নাড়লো জামশেদ চৌধুরীর দরজায়। জামশেদ চৌধুরী মরিয়মের দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললেন, 'যে ভয় করছিলাম তাই হলো শেষ পর্যন্ত।'

মরিয়ম বললেন, 'ঘরের ভেতরে ঘোমটা দিয়ে না থেকে ওদের সঙ্গে গিয়ে কথা বলো– '

জামশেদ চৌধুরী বললেন,'তোমার মাথায় মুরগীর মগজ। এই জন্যেই বলে মেয়েলোক। হুট করে একটা ডিসিশন নিলেই হলো আর কি!'

মরিয়ম মাথায় কাপড় টেনে দিয়ে দরোজা খুলে দাঁড়ালেন। রাজাকারদের একজন বললে, 'পুরুষ মানুষ কেউ নেই?'

মরিয়ম বললেন, 'অফিসে বেরিয়ে গেছে, কি, চাই কি?'

'আপনাদের ঘরের পাশে একটা লাশ পড়ে আছে।'

'সে তো সকাল থেকেই দেখছি– '

'থানায় খবর দেয়া হয়েছে?'

'কে খবর দেবে, আমাদের তেমন লোকজন নেই– '

রাজাকারদের একজন ছিলো ছোকরা বয়সের। সে বললে, 'কখন থেকে দেখছেন লাশটা?'

'সকালে জানালা খোলার পর থেকেই– '

'এতোক্ষণ ধরে পড়ে আছে, অথচ কোথাও একটা খবর দিলেন না আপনারা?'

মরিয়ম চটে গিয়ে বললেন, 'সে দায়িত্ব তো বাবা তোমাদের। বাড়ির মানুষজনদের তো আরো কাজ আছে, অফিস আদালত আছে। এসব করার সময় কোথায়?'

মাঝবয়সের রাজাকারটি এতোক্ষণ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল, সে এবার মুখ খুললো। বললে, 'আপনাদের ঘরের পাশে, আপনাদের কিন্তু মুশকিল হবে– '

মরিয়ম বললেন, 'সে তখন দেখা যাবে, পরে কি হয় সে আমাদের ভালো করেই জানা আছে– '

মরিয়মের মারমুখি ভাবসাবে একটু দমে যায় রাজাকারটি। সে ঘাবড়ে গিয়ে বললে, 'না, একটা আইনের ব্যাপার তো– '

www.nagorikpathagar.org

'আইনের তুমি জানোটা কি, করো তো রাজাকারগিরি' মরিয়ম খেঁকিয়ে উঠে বললেন, 'আমাদের সাহেব অফিস থেকে আর্মিকে টেলিফোন করবে। নাকের ডগায় একটা রাজাকার ক্যাম্প রয়েছে, অথচ ভদ্রলোকের বাড়ির পাশে একটা বেওয়ারিশ লাশ পড়ে, স্রেফ তারা গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ফতোয়া দিয়ে বেড়াচ্ছে। কেন, টেনে নিয়ে নদীতে ফেলে দেয়া যায় না।' ছোকরা রাজাকারটি বললে, 'আমরা তো খবর পেয়েই এলাম।'

'সারারাত তোমরা কি করছিলে? পুলিশ-আর্মি তো আর ডিউটি মারে না? আর্মি এর জবাবদিহি করতে পারবে তাদের সামনে? খুব ভালো করে চিনি তোমাদের। কান ধরে উঠ-বস করেও রেহাই পাবে না তখন– '

কিছু একটা ভেবে ছোকরা রাজাকারটি এগিয়ে এলো। তারপর চাপা গলায় বললে, 'মুরাদবক্স কাজটা করেছে। লাশটা পড়ে ছিল রাস্তার ধারে, লোক ভাড়া করে শেষরাতে আপনাদের ঘরের পেছনে ফেলে গেছে।'

এই রায়ের বাজারে জমি কেনার পর থেকে মুরাদবক্সের সঙ্গে গোলমাল শুরু। বহুবার চেষ্টা করেছে মুরাদবক্স জামশেদ চৌধুরীকে জব্দ করতে, কিন্তু পারেনি। বাড়ি তৈরির সময়ও লোক লাগিয়ে রাতের অন্ধকারে একবার এক পাশের একটা পাচিল ফেলে দিয়েছিলো।

মরিয়ম ডাটো গলায় বললেন,

'সেও আমরা জানি– '

'তাহলে এখন কি করা?'

'তোমরা বুঝবে। তোমরা যখন ডিউটিতে তখন কতোগুলো বদমাশ একটা লাশ টানাহ্যাঁচড়া করে অন্য বাড়ির সামনে ফেলে গেল, আর্মি এলে দেখো তোমাদের কি হয়!'

ছেলেটি খুব অসহায়ের মতো বললে, 'আমরা তো তখন জানতে পারিনি। তখন জানলে, এরকম হতো না– '

'এখনো সময় আছে,'– মরিয়ম বললেন, 'দু'চারজন লোক দিয়ে ইটখোলার দিকে ফেলে দিয়ে এসো। ঝুক্‌কি চুকে যাক। পয়সা লাগলে নিয়ে যেও আমার কাছ থেকে– '

মরিয়ম দরজা বন্ধ করে দিলেন এরপরই। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলো রাজাকার দু'জন সঙ্গে কিছু লোক নিয়ে। আবার কড়া নাড়লো দরজায় সেই ছোকরা বয়সের রাজাকারটি। বললে, 'বিশ টাকা দেন খালাআম্মা। লাশটাকে বুড়িগঙ্গায় নামিয়ে দিয়ে আসি।' টাকা দিয়ে মরিয়ম হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

জামশেদ চৌধুরী জানালার ফুটোয় চোখ তন্ময় হয়ে লাশ সরানো দেখছিলেন। ওঠানোর সময় দেখলেন শিয়াল কিংবা কুকুরে খুবলে-খাবলে লাশটার মুখ এমন ভাবে নষ্ট করে দিয়েছে যে, কারো সাধ্যি নেই তাকে সনাক্ত করে। এটা একটা ভালো লক্ষণ। সনাক্ত করতে পারলে আর এক দফা ঝামেলা বাঁধবে। ফুটোয় চোখ

www.nagorikpathagar.org

লাগিয়ে বসে থাকতে থাকতে তরফদারের উপর তিনি ভীষণ খাপ্পা হয়ে উঠলেন, এক নম্বুরে আহম্মক স্বার্থপর। পড়ে থাকতো লাশটা নিজের ঘরের পাশে তো দেখা যেত কতো গয়ংগচ্ছভাবে তুমি চলো। এই মুহূর্তে শিয়াল কুকুর কিংবা রাজাকারগুলোর কাছে বরং নিজেকে কৃতজ্ঞ মনে হয়, ঐ লোকটা একেবারে বিবেকহীন। দেশ, দেশের লোক, সবকিছুর ওপরেই তিনি বীতশ্রদ্ধ। কোনো কিছুর ওপরই তার এখন ভক্তি নেই।

লাশটা সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর তিনি জানালা ছেড়ে উঠে এলেন, ডাকলেন আব্দুলকে, বিছানার তলা থেকে টাকা বের করে বললেন, 'থলে নিয়ে বাজারে যা, কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবি আমি ঘরে নেই, অফিসে।'

আব্দুল বাজারে বেরিয়ে যাবার পর মরিয়ম বললেন, 'এর মানে কি?'

মানে তুমি। রসিকতা করে স্বচ্ছ গলায় জামশেদ বললেন, 'তুমি তো রটিয়েছ আমি অফিসে। এখন যদি বেরুতে যাই কেউ দেখে ফেলবে না?'

'লোক বটে তুমি।'

জামশেদ চৌধুরী হেসে বললেন, 'ভালোই হলো, ফাও মেরে দিলাম একটা দিন– '

কিছুক্ষণ পর মরিয়ম দেখলেন জামশেদ চৌধুরী ড্রেসিং টেবিলের আয়না খুলে খাটের মাথার দিকে বসাচ্ছেন খুব মনোযোগ দিয়ে।

বললেন, 'কি ব্যাপার?'

'ব্যাপার ভালো– '

'ভালো মানে!'

'ভালো মানে ভালো'– এই বলে জামশেদ চৌধুরী হামাগুড়ি দিয়ে খাট থেকে নামলেন, তারপর এক দৌড়ে দরোজার সামনে গিয়ে ছিটকিনি তুলে দিলেন।

মরিয়ম বললে, 'বেশ লোক তুমি।'

জামশেদ চৌধুরী মরিয়মকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'কতদিন পর আজ ফাঁকা ঘর পেলাম। উহ্ ভেবে দেখো তো।' মরিয়ম নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, 'দিন দিন ছোকরা হচ্ছো তুমি, ছিঃ'

জামশেদ চৌধুরী ঝুনুর গানের কলি মনে করে মরিয়মকে খাটের দিকে টানতে লাগলেন; কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নাই মানা, মনে মনে...

www.nagorikpathagar.org

হঠাৎ জ্যোৎস্নায়

জমিলা বেগমের ডাক নাম লিলি, ছেলেমেয়েরা ধারে কাছে না থাকলে আজকাল সিকান্দর ভূঁইয়া এই নামেই ডাকেন।

'তোমার অবসর আছে লিলি?'

'কেন– '

'একটু হাত বুলিয়ে দেবে পিঠে?'

জমিলা বেগম কিছুক্ষণ চেয়ে থ'কেন, তাঁর সে চাহনিতে থাকে ধুলোর আস্তরণের এক একটি পাতলা চাদর; একসময় বলেন, 'ভেতরের ঘরে গিয়ে বোসো, আমি আসছি!'

এই রকম, নিজের দাবীকে একটু ছোট করে, নরোম নিচু গলায় অনুরোধ করেন সিকান্দর; হলেও চলে, না হলেও একই কথা, তিনি চান না তাঁর জন্যে কোথাও সামান্যমাত্র বিঘ্ন ঘটুক। সুবিধে, অসুবিধে, এখন এইসব ভাবতে হচ্ছে। ইচ্ছে করলেই কিংবা দরকার হলে, স্বামীর পিঠে হাত রাখতে পারেন না জমিলা, তাঁকে আসতে হবে পাহাড়ের বাধা ঠেলে, সংসারে তছনছ তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়ে যাবে।

এই হিসেব কেনো, এ-ও একটা বাড়াবাড়ি এই মানুষটির মজ্জাগত দোষ, সব ব্যাপারেই; একটানা তিরিশ বছর এই মানুষটিকে দেখে আসছেন জমিলা, প্রতিটি গাঁটই তাঁর চেনা। খুব গোপনে, চুপিচুপি,আড়াল-আবডাল করে নিজেকে, মস্ত একটা অন্যায়কে উপভোগ করতে চান, এই হচ্ছে ভাবসাব; কিন্তু কেন? তিনি তো হড়াহদ্দ চেনেন, এতো সব যোগ-বিয়োগের আদিখ্যেতা ছিল কোথায় এতদিন! এক অজ্ঞাত কারণে দিনের পর দিন নিজেকে অপরাধী করে তুলেছেন সিকান্দার; কী রকম মানুষ, জীবনভর খেই ধরতে না পেরে এক এক সময় জমিলার নিজেকেই তালকানা মনে হয়, হাঁপিয়ে ওঠেন।

ঝুলকালি ধরা বয়সে, এ সময়ে একটু-আধটু থিতুনি তো আসবেই, এ-ও একটা অপরাধ; অনেক হিসেব কষে এর বেশি কিছু হাতড়ে পান না জমিলা। খুব খারাপ লাগে, টেবিলের ওপর দুমদাম কিল মেরে হাঁকডাক জুড়ে নিজের অধিকার জাহির

www.nagorikpathagar.org

করা, কিংবা ঐ একই ব্যাপারে অকারণ বিনয়ের নদী বইয়ে দেওয়া, দুটো নিয়মই তাঁর অপছন্দের, যদি এসব নিয়ম হয়ে থাকে; এই রকম ঘটলে সামান্য একটা ঘাসকুটোও কি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, এতো ক্ষুদ্র মনে হয় তখন নিজেকে, মনে হয় গুবরে পোকা, যে গুবরে পোকা, একজন মানুষের পক্ষে তার দাবি মেটানোও সম্ভব নয়, সে এমনই যৎকিঞ্চিত, জরাজীর্ণ। একটা জেদ বিশ্রীভাবে তাঁকে বেড় দিয়ে রাখে, এতদিন পর হঠাৎ যেন রোখ চেপে গেছে মাথায়, কারণ তিনি খুঁজে বের করবেনই, কিন্তু ঐ সিদ্ধান্তেই পৌঁছুতে পারেন না জমিলা বেগম। উল্টো নিজেকেই অপরাধী মনে হয়, মনে হয় তিনি কিছুই দেননি, কৃপণতা করেন এখনো; তাঁর কাছ থেকে ভিখারীর মতো হাত পেতে তবে আদায় করে নিতে হয়, 'আমি এইরকম, আমি বুঝি এই রকম?'– জট খুলতে চেষ্টা করেন।

আমি কি রকম?

তা এটা একটা প্রশ্ন বটে, অন্তত স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের বেলায়, তবে এর নিজস্ব স্বভাব ভুলিয়ে রাখা মাথাচাড়া না দেওয়া, এ যেন সেই সাপ যাকে খোঁচা দিতে নেই ভুলেও, সবুজ ঘাসের ভেতর নিজের গরজেই সে কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে আরামে, তার সম্বল এই হাল্কা আরামটুকুই; বিঘ্ন ঘটালেই সে বিষ ঢেলে দেবে।

কোনোদিন এসব উঁকি মারেনি মনে, জমিলা বেগম জানেন। ভুলে থেকেছেন তিনিও, সকলে এভাবেই ভুলে থাকে। ভুলে থাকে বলেই কি একভাবে না একভাবে জীবন কেটে যায়?

তিনি তো ভুলেই ছিলেন, খেয়াল করে দেখেননি কিছুই; দেখতে না দেখতে কিভাবে পার হয়ে গেল জীবন। শব্দ করো না, চুপ, শব্দ করো না, আরো আস্তে জানালা বন্ধ করো, ঘুম ভেঙে যাবে, আরো আস্তে আস্তে, আরো আস্তে আস্তে, আস্তে আস্তে; তারপর চোখের পাতা যখন খুললো পাক ধরে গেছে চুলে, বললে, 'আমি এসেছি, কি বুঝলে, আমি এসেছি– ' বাহ্!

তিনি কি তাঁর স্বামীকে ভালোবাসেন, কিভাবে, কতটুকু, কেমন সে, কোনোদিন একবারও তাঁর এসব মনে উঁকি দেয়নি। তিনি ডুবে থেকেছেন হাতা-বেড়ি-খুন্তি নিয়ে, সংসার নিয়ে, এইসব চিন্তা কখনো দরকারের ভেতরে আসেনি। রাত্রে চাই নিশ্চিন্ত ঘুম, জ্বালাতন সহ্য হবে না, সেজন্যে খুব যত্ন করে মশারি খাটিয়েছেন, এ ছিল প্রতিদিনের অভ্যেস, স্বামীর পাশে শুয়েছেন, তাও অভ্যেস; পেটিকোটের কষি আলগা করে দিয়েছেন, স্বামী যখন তাঁর বুকের ওপর তখন তাঁর প্রতিদিনের যথেচ্ছ দাপটটাকে সহ্য করেছেন, উঠে বাথরুমে গেছেন, অভ্যেস। ঘুমের ঘোরে হাতড়ানো, মাঝরাতে দুঃস্বপ্ন দেখে আচমকা ঘুম ভাঙার পর কোন দিকে পা আর কোন দিকে মাথা, কোথায় দরোজা, এসব ঠিক করতে না পারা, সবই অভ্যেস; এইভাবে রাশি রাশি অভ্যেসের জঞ্জালের ভেতরে একটা ঘুমকাতুরে প্রাণী আধবোজা চোখে নিজেকে বয়ে বেড়িয়েছে।

তা একটু আড়াল চাই, ঝোপঝাড় চাই; ছায়ার দরকার, ছায়া চাই। জমিলা এ-ও বোঝেন। বোঝেন বলেই বলেন, 'তুমি বোসোগে, আমি এই আসছি– '

www.nagorikpathagar.org

ঘরের ঝকঝকে মেঝেয় একটা চার পড়ে থাকতে দেখলে মনে হয়েছে অন্যায়, তিনি কুড়িয়ে নিয়েছেন। খুকু বলে 'এ তোমার বিশ্রী অভ্যেস, সবকিছুতেই বাড়াবাড়ি। পাতের ভাত পড়ে গেলেও কুড়িয়ে নিতে বলো– 'হয়তো হবে, অনেক অভ্যেসই হয়তো বিশ্রী, ভাগ্যিস চোখে আঙ্গুল দিয়ে কেউ তা দেখিয়ে দেয় না; সব সময় এমন ঘটলে খুব দুষ্কর হতো বেঁচে থাকা, অভ্যেসের ভেতরে বেঁচে থাকা।

বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে মাঝে মাঝে জোর করে মদ খেতেন সিকান্দর, তারপর ঘরে ফিরে বিছানা-বালিশ ভাসিয়ে দিতেন বমি করে, এখনো মনে আছে, যাচ্ছেতাই কাণ্ড; খারাপটুকুই বোধহয় হুবহু মনে থাকে। হালকা পালকের মতো ভেসে বেড়ানো সুখ, দেহের আনন্দ, এক একটি উদ্বেগ থেকে পরিত্রাণ, মনে পড়ে না কিছুই। কী মারপিটটাই না করেছেন একসময়, এখনো মনে আছে পিঠের কালসিরে দাগের কথা। পিঠ ফিরিয়ে আয়নায় দেখতেন কোথায় কোথায় দাগ পড়েছে, সারা গায়ের সেই ব্যথা পাশ ফিরতে গেলে ককিয়ে উঠতে হয়, মনে আছে। সিকান্দরের ছিলো তাসের নেশা, রাতের পর রাত কাবার করার অভ্যেস, ঘরে ফিরবেন সেই মাঝরাতে কিংবা ভোরবেলায়। যেদিন জিতে আসতেন তাঁর মেজাজ থাকতো দরাজ, নিজে হাতে ভাত বেড়ে খেতেন, বলতেন,' তোমার ওঠার দরকার নেই, সারাদিন কতো খাটাখাটনি গেছে– ' হেরে আসার পর আবার অন্য চেহারা। একদিন পা ধরে হিড়হিড় করে টেনে মেঝেয় ফেলে দিয়েছিলেন বিছানার চাদরসুদ্ধ, ভীষণ ব্যথা পেয়েছিলেন মাথায়। সে কি বমি, মনে পড়লে এখনো হাত-পা পেটের ভেতরে চলে যায়। এই ছিল তাঁর বদভ্যাস, কথায় কথায় হাত-পা ছোড়া, খিস্তি-বিখিস্তি করা, এক চণ্ড প্রকৃতির পুরুষ। জমিলা এই ভেবে নিজেকে সংযমী রেখেছিলেন, সব মানুষ সমান হয় না, কেউ ভালো কেউ মন্দ, কেউ ভালোমন্দ মিলিয়ে; মানুষটির এই যে অকথ্য অত্যাচার, এর পেছনে কোনো কূট উদ্দেশ্য নেই, এ তাঁর অভ্যেস, নিছক অভ্যেস।

সিকান্দর বললেন, 'লিলি ছাদে যাবে?'

'ছাদে আবার কি হলো– '

'এই এমনিই– হাত কচলাতে থাকেন সিকান্দর, 'যা পচানি গরম, ঘরে জান হাঁসফাঁস করে। ছাদে বোধহয় খুব হাওয়া– '

জমিলা বেগম বললেন, 'মানিক ঘরে ফিরেছে– '

'দেখেছি!'

'সঙ্গে একটা ফেউ, ঝাঁকড়াচুলো– '

'তাও দেখেছি!'

'সদ্য ছাড়া পেয়েছে জেল থেকে, ওদেরই দলের। এসে থেকে ভেতর দরোজা আটকে গুজগুজ করে চলেছে দু'জনে, রাত্রে নাকি থাকবে।'

সিকান্দর তাচ্ছিল্য ভরে বললেন, 'থাকে থাকুক!'

'আবার যদি একটা কিছু ঘটে; এই না সেদিন তল্লাসী করে গেলো পুলিশ, কোনো কাণ্ডজ্ঞান আছে ওদের, আস্কারা দিলে মাথায় চড়বে– '

www.nagorikpathagar.org

'তুমি বরং ছাদে একটা পাটি বিছিয়ে দিয়ে এসো।'

জমিলা বেগম বললেন, 'ওকে কিছু বলবে না?'

'কি লাভ বলে?'

'ওর ভালোমন্দের ব্যাপারে তোমার কিছু বলবার নেই?'

'বেশ তো, তুমিই বলে দেখো, একই তো কথা– '

'তাই বলে– '

আর কথা আসে না জমিলার, ভেতর থেকে কিছু একটা ঠেলে আসে, সিকান্দরের এহেন নিষ্ক্রিয়তার কোনো মানে খুঁজে পান না; ইচ্ছে করে কেউ যদি এভাবে গা-হাত-পা ছেড়ে দেয় তার সঙ্গে এতো তর্ক করে কি লাভ।

এইভাবে বখে গেছে খুকুও। সামান্য একটু মুখের কথা খরচ করতেও নারাজ এই মানুষটি; ইচ্ছেমতো চলতে দিয়েছেন খুকুকেও। শাসনের কথা তুললে বলেছেন, 'ওরা লেখাপড়া শিখছে, নিজেদের ভালো নিজেরা বুঝতে শিখুক। কেউ কাউকে শেখাতে পারে না, এসব থাকে রক্তের ভেতর, কিছু বলতে যাওয়ার মানে ওদের হাত-পা খোঁড়া করে দেওয়া; নিজেরা চলতে শিখুক– '

একে চলা বলে? কি ভালোটা হয়েছে খুকুর? আস্কারা পেতে-পেতে মাথায় চড়ে গিয়েছিলো খুকু; নিজেকে রাজ-রাজেশ্বরীর চেয়ে খাঁটো করে দেখা তার ধাতে গড়ে ওঠেনি, শিক্ষার মানে যদি স্বেচ্ছাচারিতা হয়, কি কাজ অমন শিক্ষায়! দাসীবৃত্তি করেও জীবন চলে, সেখানেও আব্রু আছে, আত্মমর্যাদা আছে, রাখতে জানতে হয়।সব জেনেশুনেই সতীনের ঘর করতে গেলো খুকু, বললে, 'ওকে আমি বদলে দেবো, আমার মতো করে নেবো'– এমন বুকের পাটা মেয়ের। কে কাকে বদল করে; স্বামীকে বদলাতে গিয়ে চোখের সামনে একটু একটু করে বদলে গেল খুকু নিজেই। এখন দিনে দু'প্যাকেট সিগ্রেট লাগে, ঘুম আসে না মদ না খেলে, পুতুলের মতো দু'দুটো দুধের বাচ্চা ফেলে চার বছর পড়ে আছে বাপের বাড়ি। তার ওই একই কথা, 'না বাপু, ন্যাণ্ডা-গ্যাণ্ডার ঝক্কি আমার সহ্য হবে না, ওসব তোমরা পেরেছ, তোমাদের গায়ে ছিলো বেড়ালের হাড়, আমার দ্বারা ওসব হবে না!' মাঝে মাঝে রশীদ যখন আসে, রশীদ মানে ওর স্বামী, জমিলা বেগম তখন মেয়ের মার-মূর্তি দেখে আঁতকে ওঠেন; দাবী করে কি হয়? তাঁর নিজেরও কি কখনো কোনো দাবী ছিলো না? পেয়েছেন কিছু? এসব নিয়ে চুলচেরা বিচার করার মতো অবসর ছিলো কোথায়! ঘর করতে এসে দেখলেন সেখানে শুধু একটাই কাজ, নিজেকে ভেঙ্গে ফেলা, ভেঙে টুকরো-টুকরো করে ফেলা– এমন না পারলে সংসারের সবকিছু থ-হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এক জায়গায়, টুকরো-টুকরো করে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে হয় সবখানে। কিছুই পারেনি খুকু। না পেরেছে রশীদকে গড়ে তুলতে, না গুছিয়ে নিতে পেরেছে নিজের আখের; কেবল ছেলে-খেলা করেছে, নিজেকে ছত্রখান করেছে, কি তামাশা! টাকা-পয়সার জন্যে পারলে এখন ছিঁড়ে খায় রশীদকে, 'আরো দাও, আরো দাও, দেবে না কেনো, তোমার ঘাড় দেবে– ' কেবল এই টাকা-পয়সার খেই ধরেই

www.nagorikpathagar.org

বুঝি সম্পর্কটা কোনোমতে জোড়াতালি মেরে এখনো বজায় রেখে চলেছে মেয়ে; মাস বরাদ্দের বাইরেও তার আদায় করা চাই, এজন্যে কতো ঝুলকাটাকাটি, কতো গুতোগুতি,নাকিকান্না; পয়সা হাতে পড়লোতো অমনিই ডানা গজালে দশখানা; চোখের সামনে রশীদকে নিয়ে ঘরের দরোজা বন্ধ করতে তখন তার একটুও যদি বাধতো। এ কোন ধরনের বিচার, জমিলা বেগমের ভাবনা-চিন্তা জট পাকিয়ে যায়, এমন খেলাচ্ছলে কিভাবে নিতে পারে এরা সব কিছুকে। কই, দেখে তো মনে হয় না কোনো অভাব আছে খুকুর, কোনো দুঃখ আছে!

ছাদে সত্যিই অন্যরকম, হু-হু হাওয়া, হাওয়ায় মধুর গন্ধ; খুব কাছেই কোথাও চাক আছে মৌমাছির। জমিলা বেগম যখন পাটি বিছানোর জন্যে এলেন তখন ছাদের কোলঘেঁষা কৃষ্ণচূড়ার শাখা-প্রশাখা হাওয়ায় থেকে থেকে ডানা ঝাপটাচ্ছে।

শহরের এ গলিটার এই একটু আগে আলো চলে গেছে, হয়তো মাঝ রাতের আগে আর জ্বলবেও না। তা না জ্বলুক, ছাদে দাঁড়িয়ে ঠিক অতখানি ভুতুড়ে মনে হয় না সবকিছু, ঘরে দম বন্ধ হয়ে আসে, অন্ধকার সংক্রামক রোগের মতো দাঁত দেখায় ঘরে। এই সময় অদ্ভুত একটা কথা তার মনে চিড়-বিড় করে ওঠে, আজকাল কিভাবে যেনো অনেক কিছুরই গরমিল হয়ে যায় হিসেবে, দরকারের সময় এটা-ওটা খুঁজে পান না। একটু আগে, ফশ করে যখন আলো চলে গেলো তন্ন-তন্ন করে মোমবাতি খুঁজছিলেন; আছে ঠিকই, তিনি নিজ হাতে রেখেছেন, কিন্তু মনে করতে পারছিলেন না কোথায়। শেষ পর্যন্ত পেলেন ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে, কুরে-কুরে খেয়ে দফা-রফা করে রেখেছে তেলাপোকা।

মাথার নিচে বালিশ দিয়ে পাটির ওপর কাত হলেন সিকান্দার, বললেন, 'তুমিও থাকো লিলি, কিছুক্ষণ থাকো– '

পাটির এক কোণে বসে গ থেকে আঁচল ফেলে দিতে গিয়ে কি ভেবে শুধু পিঠটাকে আলগা করে দিলেন জমিলা বেগম, বেশ ফুর-ফুরে হাওয়া, একটু গা জুড়াক। বললেন, 'দাও, পা লম্বা করে দাও, টিপে দিই– '

তাঁর কোল ঘেঁষে পা লম্বা করে দেন সিকান্দর; এই আরামটুকু দেওয়া-নেওয়ায় উভয়ের যে অভ্যস্ততা, সরল নীরবতার গায়ে তা ঝিলমিল করতে থাকে।

অনেক পরে জমিলা বেগম বললেন, 'তুমি মানিককে কিছু বলো– '

সিকান্দর কিছু একটা ভাবলেন, তারপর বললেন, 'তুমি বুঝতে পারো না কেনো, কোনো লাভ নেই ওদের কিছু বলে,সময়টাই এসেছে এমন। গড়তে আমরাও চাইতাম, কিন্তু কি পেয়েছি? গড়ার নামে পুরনো দেয়ালের চুন-সুরকির আস্তর ছাড়িয়ে সিমেন্ট-বালির আস্তর লাগিয়েছি কেবল। ওরা এসব মানবে কেনো? ওদের কাছে এসব মেরামত মানেই ফাঁকিবাজি। সব ভেঙে ওরা গড়তে চায় নতুন করে, মেরামতে ওদের বিশ্বাস নেই, ব্যাপার এই; তোমার-আমার কি করার আছে সেখানে স্রেফ দেখে যাওয়া ছাড়া?'

এসব কথার বিন্দুবিসর্গও ঢোকে না জমিলা বেগমের মাথায়; মনে হয় হেঁয়ালি, ধোঁয়াটে। কেবল ছেলে সম্পর্কে একটা বিচিত্র ধারণা তৈরি; মানিক যেনো তাঁর

www.nagorikpathagar.org

নিজের পেটে ধরা কেউ নয়, গম্ভীর পাহাড়ের চূড়া থেকে দশমুনে শেকলবেড়ি পায়ে নিয়ে আচমকা ঝনাৎ করে লাফিয়ে পড়েছে, অচেনা সে, বিপজ্জনক, আর তাতে গায়ে ফোস্কা পড়ে। অথচ–

এই তো সেদিনের কথা, কোল-জুড়ে শুয়ে আছে ছেলে, হাত-পা ছোড়ে আর ফিক-ফিক করে হাসে, দুপুর-রোদে এক গামলা পানির ভেতর বসিয়ে দিলে খুশি হয়ে বসে থাকে, পেছনে-পেছনে হামাগুড়ি দিয়ে ছোটে, সুযোগ মতো পা ধরে উঠে দাঁড়ায়।

'খুকুর জন্যেও তোমার কিছু করার নাই?'

'বলো কি করবো?' সিকান্দর বললেন, 'ও তো নিজেই ঐ বিদঘুটে ব্যাপারটা ওভাবে ঝুলিয়ে রেখেছে, নিজের ভালোমন্দের ব্যাপারে কখনো কাউকে নাক গলাতে দিয়েছে?'

'ভালো না লাগলে রশীদকে ছেড়ে দিক– 'জমিলা বেগম বেশ একটু জোর দিয়েই বললেন, 'ঘর করতে হলে অন্য মেয়েরা যেভাবে ঘর করে, সেইভাবে চলুক। কারো কাছে মুখ দেখানোর রাস্তা রাখেনি। একটাও যদি মানুষ হতো, সব ভস্মে ঘি ঢালা– ' 'তুমি যে কি চাও!'

'একটু বয়েস বাড়ুক, দেখবে কেমন করে চুপসে গেছে, থিতু হয়ে এসেছে; এখন বাধা দিতে গেলেই রুখে উঠবে, কোনো লাভ নেই তাতে। একটু-আধটু মার খেতে হয়, পোড় খাবে তবে শিখবে, সেই শেখাটাই শেখা। যদি কিছু বলতে যাই, ভাববে বাপগিরি ফলাতে কাঁধে একটা মোট চাপিয়ে দিল, ওটা তার নিজের ব্যাপার না, গাধার বোঝা। দাপট আমার কি কম ছিল? নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে অঙ্কের মতো স্যালুট করতে না পারলে মনে হতো আমি একটা মানুষই না, মেরুদণ্ডহীন, কাপুরুষ। মনে হতো অন্যের চাপিয়ে দেয়া একটা কিছু আজ যদি মেনে নিই কালকে তৈরি থাকতে হবে দশটা মেনে নিতে। মনে করো দেখো লিলি এক সময় আমি নিজে তোমাকে কি জ্বালানোটাই না জ্বালিয়েছি–

জমিলা বেগম ভাঙা গলায় বললেন, 'কি জানি, ওসব তুমিই বলতে পারো– ' বোঝা যায়, এ-সবে তার তেমন আগ্রহ নেই।

প্রবল উৎসাহভরে সিকান্দর বলতে থাকেন, 'লোকে বলে তাসের নেশা, তাসফাস ওসব ছেঁদো কথা; একভাবে না একভাবে নিজেকে ফতুর করা চাই, এটাই হচ্ছে নেশা। এরই জন্যে লোকে তাস খেলে, মদ খায়, রেস খেলে, মেয়েমানুষ কাড়ে। একটা বয়েসে নিজেকে নিয়ে কমবেশি সবাই এমন লোফালুফি জুড়তে ভালোবাসে। সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে হিসেব; হিসেব যেই এলো অমনি হাওয়ায় গা ভাসিয়ে নিজেকে আনতাবড়ি খরচ করায় ছেদ পড়লো। তুমি কি মনে করো যেচে কেউ হিসেবের লেজ ধরতে চায়?'

জমিলা বেগম মাথা নিচু করে থাকেন। তাঁর খোলা পিঠে গালানো মোমের মতো থ্যাঁতলানো আলো নিঃশব্দে গড়িয়ে পড়লেও আবছা আঁধার চোখ-মুখ ঘোমটায় আড়াল করে রাখে।

www.nagorikpathagar.org

'আমার নিজের কথাই ধরো, আমি লোকটা কি একটা ধপধপে ফেরেস্তা ছিলাম?' কনুই-এর ওপর ভর দিয়ে খানিকটা ঠেলে উঠে সিকান্দর নিজের গরজেই প্রগলভ হয়ে ওঠেন, 'আমার সম্পর্কে আর কতোটুকু জানো তুমি, মনে করো না নিছক ধোয়া তুলসিপাতাটি ছিলাম। এখন নিজেই অবাক হয়ে যাই, এতো সব সামলেছি কিভাবে। কতো রকমের যে গোঁজামিল; দিনের পর দিন একটার পর একটা ধাপ্পা দিয়ে যাচ্ছি, ধাঁধার পর ধাঁধা তৈরি করছি, যদি দেখি কোনো না কোনো একটা সন্দেহের বীজ বুনে দিলাম, যাতে হাবুডুবু খাও, ধরতে না পারো, নিজের গায়ে নখের আঁচড়টুকু না লাগে যাচ্ছেতাই সব ব্যাপার– '

'এখন তুমি কি চাও?' জমিলা বেগম এমনভাবে বললেন যেন তাঁর ঘুম পেয়েছে, 'এসব কথা তোলার মানে কি?'

'ওরা তো আমারই ছেলেমেয়ে, কেবল এইটুকুই বোঝাতে চাচ্ছিলাম তোমাকে; আমার ছিটেফোঁটা ধাত তো ওরা পাবেই, তুমি ঠেকাবে কিভাবে!'

কনুই-এর ভর থেকে নেমে আবার বালিশে মাথা রাখলেন সিকান্দর। চিৎ হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলেও বোঝা যায় ভেতরে তাঁর তুমুল যুদ্ধ চলছে এই মুহূর্তে।

বললেন, 'লিলি, ফরাশ মণ্ডলের কথা তোমার মনে আছে?'

জমিলা বেগম কেবল মুখ তোলেন।

'সেই যে হ্যাংলা মতোন লোকটা, হাতে একটা কাপড়ের খাঁকি ব্যাগ আর ছাতা নিয়ে মাঝে-মাঝে আমার খোঁজে আসতো! মনে নেই, সেই যে পেশকার লোকটা, মাধবপুরে বাড়ি, আমাদের আদমদীঘির জমি বিক্রির সময় যার সাথে আমার হাতাহাতি হলো, জমির বায়নার টাকা মেরে দিয়েছিল যে লোকটা– '

'হ্যাঁ,তা কী হয়েছে– '

'বায়নার টাকাটা ওভাবে মেরে দিয়েছিল কেনো জানো, ওর সঙ্গে ভেতরে-ভেতরে আমার একটা গোপন সম্পর্ক ছিলো, ও শুধু সেটারই সুযোগ নিয়েছিল। বলছি সব– ' ঢোক গেলেন সিকান্দর, তাঁর কাদা মাখা চোখ-মুখে অস্থিরতা চিটপিট করে, বললেন, 'ফরাশের একটা শালী ছিল, ময়না। বেশ অবস্থাপন্ন ঘরেই ময়নার বিয়ে হয়েছিলো, জলেশ্বরী তলায় এখনো ওদের বাড়িঘরদোর পড়ে আছে। যেভাবেই হোক ওর স্বামী খুন হয়। বারোজাতের শত্রু ছিলো লোকটার, এ নিয়ে আর কেউ খুব বেশি মাথা ঘামাতে চায়নি। স্বামী খুন হবার পর জলেশ্বরীতলা থেকে পালিয়ে ঢাকা বোনের বাড়িতে এসে ওঠে ময়না। খুব সম্ভব ওর শ্বশুর-ভাশুরদের কেউ ওর দিকে হাত বাড়িয়ে থাকবে। ঐ ময়নাকে আমি রেখেছিলাম– '

সিকান্দরের পায়ের ওপর জমিলা বেগমের আঙুলগুলো মরা মাছের মতো থির হয়ে আসে। ঘড়ঘড়ে গলায় বলেন, 'তুমি'!

'ওকে দেখে কি যে চাপলো মাথায়। জিদ চেপে গেলো, কোনো রকমেই যেন হাতছাড়া না হয়। ফরাশকে বললাম, ময়না তোমার কাছে থাক, সব খরচ আমি

www.nagorikpathagar.org

চালাবো। যতোই গাঁইগুঁই করুক ফরাশের থলের ভেতরের খবর আমি জানতাম, শুয়োরটার কাছে পয়সাই ছিলো ম'-বাপ। প্রথম-প্রথম একটু নিমরাজী ছিল ফরাশের বউও। এমন কিছু না, তা শেষ পর্যন্ত সে-ই আমার হয়ে ফরাশের কাছে ওকালতি জুড়ে দিলে। তাকে আমি বুঝিয়েছিলাম ফরাশের নিজের মতলবও খুব একটা সুবিধের না, ময়নার ব্যাপারে তার নোলাও দশ হাত বেরিয়ে আছে, ফাঁক পেলেই বাছুরের মতো হামলে পড়বে। সেই রুলি জোড়ার কথা তোমার মনে আছে? যার জন্যে পিটিয়ে আধমরা করে ফেলেছিলাম চাকর করিমকে? তোমার সন্দেহও ছিল ওর ওপর, আসলে রুলি জোড়া হাতিয়েছিলাম আমিই। ফরাশের বউকে দিয়েছিলাম। পাছে ফস্কে যায়, এই ভয়ে তখন আমি ফরাশের বউ-এর পেছনে কামড়ি খেয়ে লেগে আছি, যতো রকমে পারি তার তোয়াজ করি, মন যুগিয়ে চলি–

'তা হলে তুমিই নিয়েছিলে রুলি জোড়া?'

'বলছি তো– '

'আমার কিন্তু কোনোদিনই তোমার ওপর সন্দেহ যায়নি?'

'আমার অনেক চালাকিই তুমি ধরতে পারতে না, তা না হলে সংসারে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতো। তাস খেলতাম ঠিকই, তবে তেমন নেশা ছিলো না, তোমাদের কাছে একটু বেশি করেই দেখাতাম। তাসের নাম করে ময়নার ওখানে পড়ে থাকতাম; এইভাবে চাতুরির আশ্রয় নিয়ে জোড়াতালি মেরে দুদিক সামলাবার চেষ্টা করতাম কোনো রকমে। লিলি,সত্যি করে বলো তো কোনোদিন কি তোমার মনে কোনো রকমে খটকা লাগেনি?'

'জমিলা বেগম বললেন, 'না– '

'সত্যি বলছো?'

'খটকা লাগলে তো বুঝতেই– '

'তা ঠিক! তুমি হয়তো কিছু আঁচ করোনি, কিন্তু ভয়ে আমি আধমরা হয়ে থাকতাম সব সময়, মনে হতো এই বুঝি ধরা পড়ে গেলাম, এই বুঝি ফাঁস হয়ে গেলো সব গোমর। মানে মানে ধরা পড়ার ভয় এমনভাবে জাপ্টে ধরে রাখতো, মনে হতো আমি পাগল হয়ে যাবো। তখন কারণে-অকারণে হাম্বিতাম্বি জুড়তাম। দোষ-ত্রুটি খুঁজে না পেলে মেজাজ বিগড়ে যেতো, খুঁচড়ে কিছু একটা বের করা চাই। এইভাবে নিজেকে সামাল দিতে গিয়ে ব্যতিব্যস্ত করে তুললাম তোমাদের– '

পা বদল করে টিপতে-টিপতে জমিলা বেগম বললেন, 'তোমার পেটের ভেতর দাঁতের মাটী। এতোসব কাণ্ড! মাথা ঝিমঝিম করে শুনে– '

'এক একবার মনে হতো হাঁপিয়ে পড়েছি, এইবার হাত-মুখ ধুয়ে হালকা হয়ে যাবো, কানামাছি খেলার একটা সীমা আছে। কিন্তু পারতাম না। কতো রকমের যে পিছুটান। একটা অভ্যেস গড়ে উঠলে চট করে তা থেকে বেরুনো যায় না। এক পা পিছাই, তো দু'পা এগোই, এই খেলা খেলতে-খেলতে আরো বেশি করে জড়িয়ে পড়ি– '

www.nagorikpathagar.org

সিকান্দরের থামা দেখে মনে হয় তিনি দম নিচ্ছেন, এবং দম নেওয়ার ফাঁকে কথাগুলোকে গুছিয়ে নিচ্ছেন।

জমিলা বেগম বললেন, 'ছেলেমেয়ে হয়নি?'

'নষ্ট না করে দিলে হতো– '

'আপত্তি করেনি?'

'আপত্তির কী আছে, আমি তো তাকে বিয়ে করিনি। গোড়া মজবুত থাকলে হয় তো বেঁকে বসতো!'

'তাই– '

'তা ছাড়া ইচ্ছে করেই আমি ওকে খানিকটা দাবিয়ে রেখেছিলাম, মাথাচাড়া দিলে নানা রকমের গোলমাল পাকাতে পারতো। বহু কায়দা-কানুন করে সব কিছুর গোড়া মেরে রেখেছিলাম, বুঝলে না!'

'ছেলেমেয়ের সখ সকলের থাকেও না– '

'সখ ঠিকই ছিল– ' সিকান্দর চোখ কুঁচকে কিছু একটা ভেবে নিয়ে বললেন, প্রথম-প্রথম এসব তার মাথায় আসেনি, চোখ-কান বন্ধ করে মনের আনন্দে বিভোর হয়েছিল সে সময়। পরে কিভাবে যে তার মাথার ভেতরে ঐ গুবরে পোকাটা ঢোকে। আমার ধারণা কাজটা পেশকারের বোয়ের, মেয়ে লোকটা ছিলো বজ্জাতের ধাড়ি, যার নাম কুটকচালে– '

'ছেলেমেয়ের জন্যে ঝগড়া করতো বুঝি?'

'ঠিক ঝগড়া না, কান্নাকাটি করতো, তা-ও সেই শেষের দিকে। কেমন যেনো একটু ছিট হয়েছিল মাথায়, বসে-বসে পুতুল খেলতো– '

জমিলা বেগম হেসে উঠলেন। বললেন, 'তুমি তখন কি করতে?'

সিকান্দর বললেন, 'লাথি মেরে ওর সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিতাম, আর কি করবো! পাগলামির একটা সীমা থাকা দরকার। শেষের দিকে একেবারে দামদড়ি হয়ে গিয়েছিলো না খেয়ে-খেয়ে। ফরাশকে তুমি তখনই দেখেছো। সামলাতে না পেরে ঘনঘন আমার কাছে আসতো– '

'খেতে পেতো না কেনো, তুমি কি খরচ-পাতি বন্ধ করে দিয়েছিলে?'

'ঠিক তা নয়, ও নিজেই খেতে না। খেতো না মানে রান্নাপাতি খেলার হাড়িতে ভাত চাপাতো, এই এতোটুকুন একটা কড়ায় ভাজাভাজি করতো, একটা পাখিও তখন ওর চেয়ে বেশি খেয়ে বাঁচে– '

'ওমা সে কি কথা– '

'তা হলে আর বলছি কি! সারাদিন দেখো উঠোনে বসে কাদা ছেনে-ছেনে পুতুল, শিল-নোড়া, চুলো, পিঠে, গুচ্ছের সব আবোল-তাবোল জিনিস তৈরি করছে। এইসব হাবজা-গোবজা দিয়ে ঘর ভরে ফেলেছিল। একবার সখ চাপলো তোমাকে দেখবে। কি বিপদ! কতো রকমেই বোঝাই। তোমার সম্পর্কে মিথ্যে-মিথ্যে বলে ভয় দেখাই। বললাম দেখলে দা দিয়ে কোপাবে। কে কার কথা শোনে। না বলা না

www.nagorikpathagar.org

কওয়া একদিন এক চুড়িঅলীর সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে তোমাকে দেখেও গেছে এই বাড়িতে, বোঝো– '

জমিলা বেগম শিউরে উঠে বললেন, 'বলো কি!'

'তাহলে আর বলছি কী! ছিট মানে ছিট। তখন আমার মাথার ঘা-এ কুকুর পাগল অবস্থা। ভাবগতিক দেখে ততোদিনে সব সখ মিটে গেছে, এমন ভুল মানুষ জীবনে করে, ছিঃ ছিঃ– '

'সত্যি বলছো, এ বাড়িতে এসেছিলো?'

'হ্যাঁ, সে ঐ একদিনই। তোমাকে ওর খুব ভালো লেগেছিলো। এখান থেকে ঘুরে যাবার পর, কি যে হলো ওর বুঝলাম না, ঘন-ঘন গেলে ক্ষেপে উঠতো। অথচ আগে একেবারে উল্টোটি ছিল। ঠিকমতো হাজিরা না দিলে হাতের কাছে যা পেতো তাই আছড়ে-আছড়ে চুরমার করতো। এইভাবে যে কতো ক্ষতি করেছে তার হিসেব নেই। তোমার ভেতর কিছু একটা ও দেখেছিলো। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কেবল তোমার কথা তুলতো। বলতো পরিচয় দিলে বুবু আমাকে মারতো না, কি সুন্দর মানুষ, ছবির মতো সাজানো ঘরদোর, আমি পানি খেতে চাইলাম, একটা পিরিচে করে চারটে বিস্কুট এনে দিলো, আর টল-টলে একটা কাঁচের গ্লাসে করে পানি।

বললাম শুধু পানি খাবো, তা কি হয়, শুধু পানি কেউ দেয়, কিছুতেই শুনলো না। কতো কথাই যে বলতো তারপর থেকে, মনে উঠলেই হলো। বলতো কতো বড় মানুষ, কতো চওড়া কপাল। অমন জ্বলজ্বলে কপাল আমি আর দেখিনি। কার সাধ্যি আছে অমন মানুষের জিনিস চুরি করে নেয়। কতো রকমের যে বাতিক চেপেছিলো মাথায়, ঘন-ঘন স্বপ্ন দেখাটাও ছিলো একটা বাতিক। হঠাৎ স্বপ্ন দেখে ফেললে তোমার সামনে বসে আছে,জট ছাড়িয়ে তুমি চুলে তেল দিয়ে দিচ্ছো। একদিন বললে গতকাল কি স্বপ্ন দেখেছিলাম জানো, দেখলাম আঁশবটি নিয়ে বসে আছে বুবু, বটির কোলে ইয়া বড় একটা চকচকে চিতল মাছ, বললাম আমি মাছটা কুটে দিই। বুবু বললে এতো বড় একটা মাছ, তুমি ছেলে মানুষ, তুমি কি পারবে; বাজার থেকে এসেছে, এখন মেজাজ গরম, 'মানিকের বাবাকে একটু পাখা করোগে। বাণ্ডিল বাণ্ডিল কথা– '

জমিলা বেগম বললেন, তুমি এসব কোনোদিন আমাকে বুঝতে দাওনি– '

'এসব কি বুঝানোর কথা, কারো কাছে বলা যায় এসব?'

'বলেই দেখতে না হয়– '

'ভালোই বলেছো!'

'কোনোদিন ইচ্ছে করেনি তোমার, তাকে সংসারে আনতে?'

ঠিক ভেবে দেখিনি ওভাবে– '

'সে তো চেয়েছিলোই!'

'তা ঠিক।'

'জোর করেনি কখনো?'

www.nagorikpathagar.org

'জোর করবে কিসের জোরে। তার গোড়া তো আমি আগেই মেরে রেখেছিলাম। জানতাম ভেতরে ভেতরে ওর ইচ্ছে আছে। ঐ পর্যন্তই; ইচ্ছেটাকে আমি বাড়তে দিইনি। বুঝতো, চাপাচাপি করে কোনো লাভ হবে না– '

'তখন আমাকে বোঝা মনে হয়নি?' খুব ঠাণ্ডা গলায় জানতে চান জমিলা বেগম, 'এতোসব সামলাতে হচ্ছিলো একা তোমাকে– '

'নিজের ভুলটুকুকেই বোঝা মনে হতো, মনে হতো অতি বড় শত্রুও যেনো এমন ভুল না করে। সে-ই শুধু বলতে পারে এসবের ছ্যাঁকাটা কেমন; এই ছ্যাঁকা খেতে-খেতে দেহে-মনে সবখানে দগদগে ঘা হয়ে গিয়েছিল। ভোগের কাঙাল হয়ে দায়িত্ববোধটা আপনা-আপনিই চিড় খেয়ে যায়; আছে এমন কেউ, দায়িত্ববোধ বলতে ছিটেফোঁটাও নেই, ওদিকে মর্যাদাবোধটা একেবারে হাত ধরাধরি করে চলে; সে জন্যে তুমিও মর্যাদা পাওনি। এখন তোমার সামনে আমার আর মাথা তুলে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। ভাগাড়ের জীব ঘরের উঠোনে ঢোকার আগে সবকিছু চোরের মতো একবার দেখে নেয়, সে কারো নজরে পড়ছে কিনা; ঘটিবাটি পড়ার শব্দেই দৌড় মারে, ভাবে কেউ তাকে 'হেউ' করেছে।

'এতো ঘোরালো কথাও তুমি বলতে পারো– ' বোঝা যায় বেশ একটু বিরক্ত হয়েছেন জমিলা বেগম।

'এখন আছে কোথায়?'

'আছে মানে?'

'ছেড়ে দিয়েছো?'

'মরে ভূত হয়ে গেছে কবে– '

'কিভাবে মরলো?'

'গুটি বসন্ত হয়েছিলো, একেবারে লোহাগাড়িয়া!'

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন জমিলা বেগম। ঠাণ্ডা হাওয়া চতুর্দিকে আকুলি-বিকুলি করতে থাকে। একটা ঝাঁঝালো বুনো গন্ধ মাথার ভেতরে ঝিমঝিম করে ওঠে; ছাদের নালার মুখে শ্যাওলা ধরেছে, সেই শ্যাওলার গন্ধ।

'চিকিৎসা করাওনি?'

'জানলে তবে তো– '

জানতে না কেন?

'কি করে জানবো?' রুগ্‌ণ গলায় সিকান্দর বললেন, 'খবর দেয়ার কথা তো ফরাশের। বাড়িঘরদোর ফেলে সে হারামখোরটা বৌ ছেলেপিলে নিয়ে প্রথম চোটেই একদিকে ভেগে গিয়েছিলো। খুব কষ্ট পেয়ে মরেছে–

'আহা!'

'ভাগ্যে ছিলো, কি করবে– '

'অমন ভাগ্যের কপালে ঝাড়ু মারি!'

www.nagorikpathagar.org

একথার কোনো উত্তর খুঁজে পান না সিকান্দর। এক সময় তাঁর এ-ও মনে হয় সব কথার উত্তর হয় না; সব কথার যারা উত্তর খোঁজে তারা মূর্খ। উত্তরের নামে তারা কেবল বাজে কথার ভুষুড়ি ভাঙে।

'তোমার কষ্ট হয়নি?'

'কষ্ট মানে, খুব মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মরার সময় দেখতে পারলাম না, কাছে কেউ ছিলো না যে মুখে একটু পানি দেবে। বেঁচে থাকতে তো আর কম জ্বালায়নি, খবর পেলে অতটুকু কি আর করতাম না!'

'জালিয়েছো তো তুমিও– '

'এখন আমারও তাই মনে হয় লিলি!'

'ইচ্ছে করলে তো তুমি ওকে ছেড়ে দিতে পারতে। তুমি ছেড়ে দিলে এভাবে দগ্ধে-দগ্ধে মরতো না বেচারি– '

'তা পারতাম। তবে ছেড়ে দিলেও সে যেতো না। প্রায়ই তো বলতো, একদিন এসে দেখবে আমি যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাবো। ঐ পর্যন্তই, আমি তো আর তার পায়ে শেকলবেড়ি পরিয়ে রাখিনি। যেতে তো পারলো না– '

'ইচ্ছে করলেই যাওয়া যায়? তুমি পারো?'

'আমি যে কি পারি আর না পারি তা আমি নিজেই জানি না– '

'বাপ-ভাই কেউ ছিল না, আরে ফুটো কপাল!'

'ভাইরা ছিলো। তারা সব অন্য ধান্ধার মানুষ। জমি-জিরেত নিয়ে কারবার। খোঁজ নিতে গিয়ে যদি আবার কাঁধে ল্যাঁঠা জুটে যায়। বোনরা তো পৈত্রিক সম্পত্তির ভাগ পায়। বোঝ না কেনো।'

জমিলা বেগম একটা দমকা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'খুকু তো ওই কথাই বলে। কিছু বলতে গেলে তেড়ে আসে, তোমাদের এতো মাথা-ব্যথা কেনো, আমি তো আমার নিজের অংশে আছি, ভাগে কি আমার এই ঘরটুকুও পড়বে না–

'বলে বুঝি?'

'বলে না আবার। মেজাজ ভালো না থাকলে মান সম্মান রেখে কথা বলে কারো। বলে বেশি তেড়িবেড়ি করলে চুলচেরা ভাগ বসাবো। তখন দেখবো তোমরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াও– '

'এসব রাগের কথা– '

'শুধু আমি ঐ জিনিসটা চিনলাম না!'

'চেনোনি বলেই আমি বেঁচে আছি। তোমার অনেক দয়া লিলি, তোমার অনেক দয়া। কতো বড় ভাগ্য আমার, তোমাকে পেয়েছিলাম। সারাজীবন তুমি আমাকে ছায়া দিয়েছো, সারাজীবন, আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ লিলি, আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ– '

'ইশ্! যেন রেডিয়োর নাটক!'

জমিলা বেগম হাসতে লাগলেন।

www.nagorikpathagar.org

সিকান্দর আহত হয়ে বললেন, 'লিলি তুমি হাসছো!'

'হাসবো না তো কি করবো, তোমার মতো করে বলতে জানি আমি? আমার বাপদাদাও পারতো না। আজেবাজে কথা রাখো। রাত্রে কি খাবে, ভাত না রুটি?'

'আজ আর কিছু খাবার ইচ্ছে নেই– '

'কি আহ্লাদের কথা। এই যে এতো কপচালে, তারপর প্রেসার বাড়লে দেখবে কে, রাত্রে ঘুমুতে পারবে?

'সিডাকসিন দিও– '

'তা না হয় দিলাম, কিন্তু একেবারে খালিপেটে থেকো না– '

'ঠিক আছে, শুধু এক কাপ দুধ– '

শাড়িতে পিঠ ঢেকে জমিলা বেগম উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'আজও বোধহয় ইলেকট্রিক বিল জমা দাওনি– ' 'দেখি, কাল হয় কিনা।'

'লাইন কেটে দিলে খুব ভালো হবে। মানুষ একটা তুমি। আমি নিচে থেকে আসি– '

একটু পরেই আবার ফিরে এলেন, হাতে দুধ-ভরা গ্লাস।

বললেন, 'নাও, ওঠো– '

'তাই বলে এতোটা, তোমাকে না বললাম কাপে করে আনতে?'

'হ্যাঁ, না খাইয়ে মারি আরকি– '

'তুমি কি ভাবো, এতো সহজে আমি মরবো!'

'মিটসেফটা ঠিক করাবে না, কতোদিন থেকে বলছি, তুমি কানে তোলো না। বলো তো যাই আমিই মিস্ত্রী ধরে আনি। সেই কবে থেকে জালি ছিঁড়ে গেছে, ইঁদুর তেলাপোকার যন্ত্রণায় আমি পাগল হয়ে যাবো– '

'রোববার আসুক, এবারে আর নড়চড় হবে না কথার!'

দুধ শেষ করে জমিলা বেগমের আঁচলে ঠোঁট মোছেন সিকান্দর। এই সময় অপরাধবোধ ভেতর থেকে তাঁকে চাবুকপেটা করতে থাকে। বললেন 'লিলি তুমি আজ কতো দুঃখ পেলে, আমাকে মাপ করে দিও– '

জমিলা বেগম বসলেন, একপাশে গ্লাসটাকে সরিয়ে রেখে কোলের ওপর সিকান্দরের একটা পা টেনে নিলেন। তারপর অভ্যস্ত হাতে টিপতে-টিপতে বললেন, 'দুঃখ পাবার কি আছে। তবু তো তুমি সব বললে। যতোদিন দাগ লেগে ছিলো মনে ততোদিন গোপন করেছো। হয়তো অনেক মানুষ আছে, যারা কোনোদিন বলেই না– '

'তবু– '

'তবু কি?'

'অমি তোমার সুখের জন্যে একদিনও ভাবিনি, আমার সংসারে এসে তুমি ঠকেছ– '

'ওই রকমই সবকিছু। ভালোলাগার মন থাকতে হয়।'

www.nagorikpathagar.org

সিকান্দর বললো, 'থাক না, অনেক দিয়েছো, হাত ব্যথা করবে– '

'আমার অভ্যেস হয়ে গেছে।'

'কি করে যে অভ্যেস হয়।'

'মানিকের পরে আরো একটা দিতে– '

'কি হতো তাহলে?'

'এমন অভ্যেস হতো না– '

'তাই বুঝি?'

'তবে আবার কি! এই পা কোলে নিয়েই তো বাকি সময়টা কাটিয়ে দিলাম।'

'এতো ভালোবাসো তুমি ছেলেপিলে?'

'বড় হলে আর ভালো লাগে না।' বড্ড পর হয়ে যায়। কেউ যেনো চিনতে পারে না।

এক একদিন সবকিছু এমন ফাঁকা লাগে, ওরা কেউ একদিনও আমাকে মা বলে ডাকে না কতো যে ইচ্ছে হয় ওরা বুকের ভেতরে মুখ রেখে ঘুমিয়ে থাকুক– '

'অমন মনে হলে আমাকে বুকের ভেতরে নিও– '

'মানিকের গালের সেই নোনতা স্বাদের কথা তোমার মনে আছে?'

'আছে– '

'একবার বুকের ওপর নাচানোর সময় পেচ্ছাব করে দিয়েছিলো না মুখে? সে স্বাদ এখনো আমার মুখে লেগে আছে। কি নরোম, কি গোলগাল, এখন পেলে তুলোর ওপর শুইয়ে রাখি। আমার ছোট্ট ক্ষীরের পুতুল– '

সিকান্দর হাসেন। বলেন, 'লোভ লাগে– '

এইসব কথা হয়। মানিককে নিয়ে, খুকুকে নিয়ে। একবার মানিক, একবার খুকু। শুনতে-শুনতে তন্দ্রা আসে সিকান্দরের। তন্দ্রার ভেতর সিদ্ধান্ত নেন সিকান্দর, কালই একটা ফায়সালা করে ফেলবেন সবকিছু। খুকুকে বোঝাবেন, ফিরিয়ে আনবেন মানিককে। চাকরি থেকে অবসর নিতে হবে, আর বেশিদিন নেই। পেনশন বেচে দেবেন। পেনশন বেচে ছাদে ঘর তুলবেন। সবাই মিলে ওপরে থাকবেন, নিচের তলা ভাড়া। গ্যাসের লাইন নিতে হবে, আরো কতো কি–

'রাত্রে বৃষ্টি হবে, দেখো না কি রকম ঠাণ্ডা হাওয়া ছেড়েছে– '

পা টেপা আরামের ভেতর ততোক্ষণে তিন-চতুর্থাংশ ডুবে গেছেন সিকান্দর, ইচ্ছে থাকলেও উত্তর দিতে পারেন না। এক সময় কেবল বুঝতে পারেন বিড়ালের মতো একটা হাত নিঃশব্দে তাঁর পায়ের ওপর থেকে নেমে গেছে; তারপরই ধুপ করে একটা শব্দ।

কেমন যেনো একটা শব্দ। বাসা থেকে একটা পাখির বাচ্চা পড়ে গেলে যে শব্দ হয় ঠিক তেমন নয়; যেনো খুব কাছেই ধসে পড়লো একটা বাড়ির পুরনো ছাদ।

www.nagorikpathagar.org

মনসা, মাগো

আনোয়ার আলি সহাস্যে বললে– অ্যাকটিংটা থুয়ে দে শালা, পিছন ফেরালেই তো জানোয়ার আলির মুখে কালি বলে গাল পাড়বি। আমি যা বলবো সাফ সাফ মুখের ওপর, ওসব তোমো তোমো কথা আমার দ্বারা কখনো হবে না। তোরা গুলতানি মেরে নরক গুলজার কর, আমি ডেরায় চললুম!

আমার সঙ্গীর নাম কানা সাড়ে তিন পাঁট। কানা এবং সাড়ে তিন বোতল দেশী মদ একাসনে পান করতে অভ্যস্ত বলে লোকটি ওই নামেই বিখ্যাত। আনোয়ার আলির সঙ্গে তার সম্পর্ক বা যোগাযোগের সূত্র আমার অজানা, যতদূর মনে হয় দু'জনের পরিচয় বহুদিনের এবং বহু কীর্তির সঙ্গে উভয়ে জড়িত। কানা সাড়ে তিন পাঁট জিভ উল্টে নাকের ডগা চেটে উরুর উপর একটা হালকা থাবড়া মেরে দুলতে দুলতে বেশ একটু তোষামোদের সুরে বললে– অই শোনো, তুমি চলে গেলে এঁড়ে বাছুরের মতো বাঁ বাঁ করতে করতে গলা দিয়ে খুন করবে যে। দোহাই তোমার ওস্তাদ, একেবারে আঁধারে চুবিয়ে মেরে রেখে যেও না– ধর্মে সইবে না!

আনোয়ার আলি কি মনে করে আবার বসলো। মনে হলো আমাকে কিছু বলবে। পরক্ষণেই ভাবান্তর মুখে খুব স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। বললে, শালার সারা গতরটা যা টাটান টাটাচ্ছে না। মনে হচ্ছে এক হপ্তা বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবো না!

কানা সাড়ে তিন পাঁট রসিকতার সুরে বললে– ওসব ভালো করেই বুঝি। মাদুরে শোওয়া গা ডবল তোশক পেলে টাটাবে না তো টাটাবে কিসে। ইস্ শালার যাকে বলে একদম ফেটে পড়া স্বাস্থ্য, উথলে ওঠা স্বাস্থ্য, চলকে পড়া স্বাস্থ্য, থমথমে টাটানো যৌবন।

বেশি কপচে কাজ নেই, থাম! কারো গতর টাটানি কারো চোখ টাটানি। আবে শালা কানা, তোর নোলা দিয়ে বুঝি নাল ঝরছে, না রে? মাল ছেড়ে দেখ না, তোর গলাতেই যদি ওই জান্নাতি কবচ লটকে না দিয়েছি তো একবাপের বেটা নই।

– এহ্, একেবারে কৃতার্থ হয়ে গেলুম আর কি।

www.nagorikpathagar.org

কানা সাড়ে তিন পাঁট বগল চুলকাতে চুলকাতে বললে– মুফতে হলে একবার টেস করে দেখতে পারি!

আনোয়ার আলি মুখ ভেংচে বললে, ওরে আমার নাত জামাইরে! শালার ব্যাটা শালা কানা বলে চক্ষুলজ্জাটাও কি ধুয়ে খেয়েছিস? তবে শোন্ তিনটে জিন্নামার্কা পর্যন্ত দাম উঠেছে, আমি পাঁচটার কমে ছাড়বো না, তার চেয়ে বরং দোলাই খালে ভাসিয়ে দেব। ভেবেছিস মুফতের মাল, ভাগাড়ের শকুন কোথাকার! এরকম খাঁটি জিনিস দু'দশ বছরে এক আধটা শিকে ছিঁড়ে পড়ে! আবে শালা কানার মরণ, রা কাড়ছিস না কেন?

সাড়ে তিন পাঁট বিমর্ষ হয়ে বললে,– তোমার মুখের ট্যাকসো থাকলে আর এভাবে বলতে পারতে না। যাই বলো তুমি ওস্তাদ বড্ড স্বার্থপর। সাধ্যে কুলায় তোমার এমন কোন কাজটা না করে দিয়েছি বলো, অথচ আমরা কিছু আবদার করলে অমনি ষোলো আনা হিসেব কষতে বসবে। এমন নয় যে নিকে করা বউ, কোথাকার পাখি কোথায় চলে যাবে। আমরা চিরকাল নামেই ইয়ার-বক্সু থেকে গেলাম!

– ওপ্ দুঃখে একেবারে পেটের পিলে ফেটে যাচ্ছে বুঝি! আজ কি সাড়ে তিন পাঁটের বেশি হয়ে গিয়েছে?

খালি বোতলটা দূরে ঘাসের ওপর সজোরে ছুঁড়ে দিয়ে কানা সাড়ে তিন পাঁট তিরিক্ষি মেজাজে বললে– যাও যাও, নিজের ধান্দায় যাও। বেশি ফ্যাচোর ফ্যাচোর করো না। তোমার কথাগুলো মনের ওপর পেট্রলের টিন উপুড় করে দিয়েছে।

তুলনাটা ভালো লাগলো আমার। কানা সাড়ে তিন পাঁটের মুখে বলেই ভালো লাগলো। আনোয়ার আলি পকেট থেকে একটা রেশমী রুমাল বের করে যত্ন করে মুখটা মুছলো তারপর পেশীবহুল হাতদুটো ওপরের দিকে তুলে আড় ভেঙে জড়িয়ে জড়িয়ে বললে– তাহলে উঠলাম হে, একটা বৈঠক আছে আবার।

– বিদেয় হও না, কে তোমায় পাঁজাকোলে করে ধরে রেখেছে।

তারপর প্রকাণ্ড আনোয়ার আলি চলে যেতেই আমার পাশে আরো খানিকটা সরে এসে বললে,– শালার জানোয়ার আলির মুখে কালি। দেখলেন তো কেমন অখাদ্য!

আমি বললাম– ঠিক বুঝলুম না।

– কেন গুরু, অন্য জগতে বিচরণ করা হচ্ছিল বুঝি?

বললাম,– কোনো একটা কিছু ভাবছিলাম নিশ্চয়ই, আবার তেমন কিছু না। তোমার কথা বলো, চুপচাপ ভালো লাগছে না।

কানা সাড়ে তিন পাঁট বললে– নির্লজ্জ বেহায়া কি আর গাছ থেকে পড়ে। হনুমানটার কথা শুনলেন, শালার ব্যাটাকে আচ্ছামতো দুরমুশ করা যেতো। কতো জায়গায় যে ঢিট হয়েছে তার হিসেব নেই, একটা জ্যান্ত শয়তান। মেয়ে মানুষ বেচে শালা লাল হয়ে গেলো।

www.nagorikpathagar.org

আমি তার মন রক্ষা করার জন্যে বললাম– লোকটাকে আমারও খুব অসহ্য ঠেকেছিলো। তুমি যে রকম তোয়াজ করছিলে প্রথমটায়।

কানা সাড়ে তিন পাঁট আমার মুখের দিকে তাকিয়ে খুব অন্তরঙ্গ হয়ে বললে,– ইস্ আপনার চোখ একেবারে লাল জবাফুলের মতো হয়ে গিয়েছে, রক্ত ফেটে পড়ছে, বরং স্টপ করে দিন। আমার বলতে ইচ্ছা করছিলো, এখন ও দুটো আর চোখ নয় ও দুটো আমার টুকরো করা হৃদপিণ্ড, কিন্তু লোকটা বুঝবে না, সুতরাং চুপ থাকতে হলো। আমার মনে যা তোলপাড় করছিলো তাকে পাত্রে ধরে রাখা যায় না, কেননা মধ্যরাত্রির শিকার বাটিখানার নিঃসঙ্গ এক মাতাল দুমড়ে-মুচড়ে একাকার শীৎকার চিৎকার... গলিত শবের মাংসভক্ষণ কাফন সংগ্রহ শেষ করে ধূর্ত শৃগাল ও নির্বিকার তস্কর কবরখানার বাইরে শীতরাত্রির কৌমার্যে আগুন ধরাবার তুঙ্গ অভিপ্রায়কে উসকে দিয়েছে। কেননা মৃত্যুর মতো ভালোবেসে, দুর্দান্ত দস্যুর মতো উপভোগ করে গুটিকতক জন্মান্ধ কর অবিশ্বাস ও কান্নার মতো স্নিগ্ধ আচ্ছন্ন এবং ন্যুব্জ নগরে গম্ভীর দুর্ভাগ্যের বীথি দু'পাশে ফেলে জ্বলন্ত বাদুড়ের মতো প্রকীর্ণ চিহ্নে নিশ্চিহ্ন। কেননা পৃথিবীতে সব মোৎশার্টই মৃত, প্রত্যহের আটলান্টিক ডাকাতিয়া নদী, বিজ্ঞান বিমর্ষ, ঠিক তেমনি ভ্রষ্টা ইহুদি রমণী আজ কোথায় যেমনটি জান দ্যুভাল! কোথায় কোন অনিশ্চিতেই না ভাসমান রুগ্‌ণ আবিষ্কারের স্রোতে। আর পাপের যন্ত্রণা চিৎকার আর্তনাদ দংশনে হন্যে কুকুরের স্বজাতি তথাপি চন্দন কাঠের মূল্য প্রাচীন শ্বেত কৌটায় সাজিয়ে রাখতে বলো কি রহস্যময় তোমাদের যাদুঘরে কাঁচের স্বচ্ছ কফিনে। পাপে দগ্ধ আমার সর্বাঙ্গ। পাপে দগ্ধ আমার দগ্ধ-দগ্ধ-দগ্ধ। দগদগে শরীর ছাল ছিলে অর্ধ-উন্মাদের মতো নিজেই খাই। তারা যখন কালো পাপের, অতি অন্তরঙ্গ অতি সুস্বাদু সুপেয়– রক্তপ্রবাহী চিহ্নগুলো কালো কালির আঁচড়ে লিখে নেয় তখন অতি স্বার্থপর নিঃসঙ্গ এবং স্তম্ভিত শয়তানও চিৎকার করে ওঠেন, আমাকে অন্ধত্ব দাও, আমাকে অন্ধত্ব দাও, আমাকে অন্ধত্ব দাও।

কানা সাড়ে তিন পাঁট বললে,– তুমি শুধু দেখে নিও, ও শালা বাঁদরমুখো জানোয়ার আলির মোষের মতো শরীর আমার ট্রাকের তলায় পড়ে একদিন ছাতুছানা না হয়ে যাবে না। শালার যে সে ট্রাক নয় একেবারে সাতটনি মার্শেলাইজ বেনচি! গুরু একটা কথা বলি কিছু মনে করে বসো না যেন আবার, আমি কিন্তু তোমাকে তুমি বলেই বলছি– আচ্ছা তোমরা তো সব লেখাপড়া জানা শিক্ষিত লোক, এ সব নোংরা আস্তাকুঁড়ে পা রাখতে তোমাদের সংকোচ হয় না?

আমি বললাম,– শিক্ষিত লোকদের ওই একটা মস্তবড় গুণ, দুনিয়ার সব জায়গাই তাদের চেনা হয়ে যায়, সহজে সব জায়গাতেই গা ছেড়ে বসতে পারে। তোমাদের দুনিয়ার বাইরে তোমরা অচল!

www.nagorikpathagar.org

– তা যা বলেছ গুরু একবার চ্যাং চ্যাং হোটেলে জোর করে নিয়ে গিয়েছিলো তোমারই মতো একজন, আমার সে কি কাঁপুনি ভিতরে ঢুকে, কিছুতেই আর মুখ তুলে বসতে পারিনে। তা গুরু চলো উঠি। হারামখোরের তারা পাততাড়ি গুটোতে শুরু করে দিয়েছে।

আমি অনুনয়ের সুরে বললাম,– এখনই ঘরে ফিরতে চাই না, আরো কিছুক্ষণ থাকো না আমার সঙ্গে। অন্য কোথাও চলো যেখানে সারারাত কাটানো যায়, খরচ আমি দেবো।

কানা সাড়ে তিন পাঁট বললে– আজ অনেক খসেছে, আবার কেন?

– ওসব কিছু নয়।– আমি বললাম,– এই যে তুমি আমাকে সঙ্গ দিচ্ছ, আমার কাছে কিন্তু এটাই বড়, আর কাছে আছে বলেই ওড়াচ্ছি, যখন থাকবে না তখন আসবো না।

– যাই বলো গুরু, তোমাদের বুঝতে যাওয়াটা একটা মস্ত ফ্যাসাদ। চলো কোথায় যাবে।

সব দৃশ্যকে তখন চাঁদ গিলে খাচ্ছে। সুখ নামক অদ্ভুত এক রোগের মড়কে সারা ঢাকা শহর উজাড় হয়ে গিয়েছিলো বহু আগেই। স্যাণ্ডেলের গোড়ে গোবর লেপটে যাওয়ার মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিলো বুঝিবা পৃথিবীর কাঁচা মাংসের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছি। রসালো রাত্রিটাকে কারা যেন নিংড়ে তার সবটুকু রস বের করে নিয়ে চারপাশে ছত্রখান করে রেখে গিয়েছে শুধু নীরস আঁশ।

কানা সাড়ে তিন পাঁট বগলা ধোঁয়া ছেড়ে বললে,– বুঝলে গুরু, মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে শালার হাড়-হাবাতে জানোয়ার আলিটার কল্‌জে বের করি। কাফেরটার ধর্ম বলে কিছু নেই, পয়সা তো রাস্তার হাজামজা নুলোভিখারীগুলোও রোজগার করে, অমন পয়সায় আমি মুতে দেই। গাঁ-গেরামের মেয়েমানুষকে গায়েব করে বেমালুম দু'একশো টাকায় বেচে দিচ্ছে, লাখ টাকা দিলেও আমরা বাপু অতোটা নিচে নামতে পারবো না, হ্যাঁ।

কানা সাড়ে তিন পাঁট এইভাবে অনর্গল বলা শুরু করলো। আনোয়ার আলিকে নিয়ে তার কথার তুবড়ী যেন আর ফুরোতেই চায় না। আমি ভাবছিলাম সন্ধ্যাবেলার কথা যখন আমার ভিতরটা এমনভাবে গুমরে উঠেছিলো যে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলাম। মনে হয়েছিলো কষ্টের একটি করুণ শীর্ণ নাম-না-জানা নদী আমাকে ভয়ংকর অনিশ্চিতের দিকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে, আমি এমন অসহায় এমন নিরুপায় এমন রুগ্‌ণ যে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি তেমন শক্তি নেই। কি করবো, কোথায় যাবো, যেন বিদীর্ণ হতে চাই, যেন এক খাবলা আকাশ ছিঁড়ে নিয়ে কারো মুখে ছুঁড়ে মেরে শান্তি পাবো, এই সব মনে হয়েছিলো। সন্ধ্যাদেবী দরোজার বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, আমি বের হতেই রহস্যময় আবরণের ভিতর থেকে তার অপরূপ হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, মুখে কিছু না বলে

www.nagorikpathagar.org

আকাশের দিকে আঙ্গুল নির্দেশ করে বলতে চাইলেন এক একটি তারার এক একটি স্বতন্ত্র অর্থ আছে, ওই সব অর্থ জানতে যেও না। তারপর আমাকে ভাঁটিখানায় পৌঁছে দিয়ে নিঃশব্দে নিজের পথে চলে গেলেন। তখন কানা সাড়ে তিন পাঁট, আনোয়ার আলি, ফৈজুদ্দিন কাওয়াল কেউই সেখানে ছিলো না। আমার কি যে মনে হয়েছিলো, মনে হয়েছিলো– আমাদের দাদীমারা নিকোনো উঠোনের কোণে প্রাচীন পিঁড়িতে উপবেশন করে গনগনে উনুনে চেলাকাঠ প্রবেশ করিয়ে জাড় ভাঙছিলেন আর ফিসফিসিয়ে ভয়ংকর শিরা উপশিরাগুলিকে কিছু বলছিলেন, হাসছিলেন অর্থহীন, উদোম রাত্রি, কি মাংসল তার শরীর, পিষ্ট হতে চায়, আগুনের চঞ্চল শিখা থেকে কাঁপছে রাত্রির নরম মসৃণ সুগোল বাহুতে, ভাষা দাও! আমাদের দাদীমারা নিকোনো উঠোনের কোণে প্রাচীন পিঁড়িতে, হে রূপসী তাড়না তোমার আনাজ কোটার কি শেষ নেই? গলে পড়া চাঁদ, গলে পড়া অন্ধকার, গলে পড়া বাতাস, গলে পড়া আকাশ, গলে পড়া বয়স, গলে পড়া অবসাদ, গলে পড়া হিম, গলে পড়া স্বর্গ-গভীর থমথমে নাভীর গায়ে জমা লবণ জলের সৌন্দর্যে মসৃণ পিঁড়ি, অলস উপবেশন, নিকোনো উঠোন, তাঁদের অর্থহীন প্রলাপ-স্বর্গীয় স্বগতোক্তি, বৃষ্টির মতো স্মৃতির শালা; বাস্তুঘুঘু, তোমায় একদিন ঘুঘুর ডিম খাইয়ে ছাড়বো, না হলে কান কেটে কুকুরের পায়ে ঝোলাবো।– কানা সাড়ে তিন পাঁট বললে– বুঝলে গুরু, ওই একটা কথা আছে না বেশি বাড় বেড়ো না ঝড়ে পড়ে যাবে, শালার ঠিক তাই হবে। একদিন শালাকে নর্দমার পানি না খাইয়ে ছেড়েছি তো নামই বদলে দেব। চিরতে জানলে একটা ধান দিয়েও কারো পেট চেরা যায়। তা গুরু কাছাকাছি একটা তিন তাসের আড্ডা আছে, যাবে নাকি সেখানে? রাত কাবার করার জন্যে খুবই যুতসই।

আমি বললাম– ওই ব্যাপারটা আমার দুচোখের বিষ। চলো নদীর দিকে যাই, এই সময় খুব আশ্চর্য মনে হবে নদীটাকে।

– অ্যাই মেরেছে। তোমার যতো সব অনাসৃষ্টি কথা গুরু, ওখানে ঘোরাঘুরি করতে গেলে সেপাইরা সন্দ করে টানা-হ্যাঁচড়া জুড়ে দেবে, ভাববে আমরা জানের খারাবি করতে গিয়েছি। তার চেয়ে চলো যে যার নিজের ঘরের দিকে ফিরি, আমার আবার কাল সক্কাল সক্কাল খ্যাপ মারতে যেতে হবে সেই আড্ডায়।

বললাম সেই ভালো, আমি তাহলে চলি, আবার দেখা হবে।

দুই.

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি সারা শরীর অদ্ভুত ঝরঝরে হয়ে গিয়েছে। মনে গ্লানির আঁচড়টুকু পর্যন্ত উধাও। দুদিন পর সময়মতো অফিসে ছুটলাম। সারাদিন যেন নেশার ঘোরেই বুঁদ হয়ে থাকলাম কাজের চাপে।

www.nagorikpathagar.org

তারপর অফিস থেকে নিজের আস্তান। আবার সেই সন্ধ্যা। আবার মন খারাপ হয়ে যাওয়া। আবার বেরিয়ে আসা ছুটে। একটা রাস্তা ধরে পাগলের মতো শুধু হাঁটতে লাগলাম। মনে পড়ে, এক এক সময় নিজের অস্তিত্বকে মনে হতো শ্বেত পাথরে মোড়ানো মসজিদের একটি প্রাচীন চৌবাচ্চা যার ফোয়ারা অকারণে স্তব্ধ হয়ে আছে। যেখানে সহজে পোষমানা, আমার রক্তের লাল আর সাদা মাছেরা নির্লিপ্ত সুখে হাঙরের হাঁ, বঙ্গোপসাগরের গভীরতা আড়িয়ালখাঁর বুকে মেঘে উদাস খাঁ খাঁ ছায়ার কথা অনন্তকালের জন্যই বিস্মৃত হয়েছে। প্রতিদিন নির্বিকার অভ্যস্ত শিকারীর দল সন্তর্পণে শেষ করে দশ আঙ্গুলের চাঞ্চল্যে বলে গিয়েছে, ফিরিয়ে নাও ফিরিয়ে নাও তোমার লবণাক্ত সমুদ্র, ফিরিয়ে নাও তোমার অরণ্য দীঘির করুণ জল আর শোকার্ত নগ্ন আকাশ, দাও সোনার হরিণ। তারপর সাইরেনের আতঙ্ক স্তব্ধ হয়ে শোনে ক্ষয়িষ্ণু জিজ্ঞাসা। প্রয়োজন হয়েছে জানাবার। আবার আমার স্বচ্ছ শরীরে ছায়া পড়েছে তাদের করুণ ম্লান সংকল্পচ্যুত ভয়ংকর বীভৎস সারি সারি মুখের। কখনো নিজের অস্তিত্বকে মনে হয়েছে ক্রূর উল্লাসে ফেটে পড়া ভূমধ্যসাগরীয় ঝড় কবলিত একজন নিঃসঙ্গ নাবিক-জলাতঙ্ক আক্রান্ত, স্মৃতি বিস্মৃত বিকৃতমুখ দংশনলোভী, যার ভিতর নেই কোনো আটলান্টিক, নেই কোনো আলোকস্তম্ভ, কোনো প্রবালদ্বীপ, দিকচক্রবাল। মনে হয়েছে জনহীন বিশাল এবং নির্দয় পৃথিবীতে আমি পতিত আদম-নিঃসঙ্গ, নির্বোধ এবং নিরোগ, যার চোখে স্বর্গের স্মৃতি, নিসর্গ ভয়ংকর।

এখন ঠিক কি মনে হয় তা জানবার আর উপায় নেই। খোলা পাত্রে স্পিরিট ঢেলে রাখলে যা হয় ঠিক তেমনি করেই যেন যাবতীয় চিন্তাধারাগুলি চিরকালের জন্যে উঠে গিয়েছে। এক বোতল যৌনক্রীড়া পান করে যারা নিশ্বাসের মনে অসংখ্যবার কামারশালার হাপর হবার জন্যে জন্মেছে তাদের বিকৃত ও আক্রান্ত চিন্তাগুলি নিদ্রার চেয়ে মূল্যবান নয়।

এখন আমি কোথায় যাবো। পৃথিবীর কোনো নির্বাসনই সুনির্দিষ্ট নয়। মনে হয় আমি অন্ধ বধির। কোনো শব্দ আমার কর্ণপাট স্পর্শ করে না। আমার চোখের সামনে নেই কোনো খোলা মাঠ, নেই কোনো নদী, আমাকে ডাকে না একটি দরোজাও, পৃথিবীতে বন্ধ হয়ে গিয়েছে সব জানালা।

এক সময় আমাকে ভীষণভাবে চমকে দিয়ে প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়াল একটা লম্বা যন্ত্রদানব, আগে থেকেই ঘন ঘন হর্ন বাজছিল, ড্রাইভারের আসন থেকে কানা সাড়ে তিন পাঁট চেঁচিয়ে বললে– উঠে এসো গুরু, উঠে এসো।

আমি উঠে তার পাশে বসতেই বললে– তুমি অনেকদিন বাঁচবে গুরু, এইমাত্র তোমার কথা মনে হয়েছিলো। আজ তোমাকে আমার ভীষণ দরকার।

বললুম কি ব্যাপার কী।

– পরে সব বলবো, আগে ফ্রী হয়ে নেই। শালার এই মার্শেলাইজ বেনচি আমায় না ডুবিয়ে ছাড়বে না। তোমাদের দোয়ায় যা বাঁচা বেঁচে গেছি আজ।

www.nagorikpathagar.org

পথে আর কোনো কথা হলো না। কানা সাড়ে তিন পাঁট মুখ অন্ধকার করে গাড়ী চালিয়ে সোজা তার গ্যারেজে ঢুকলো তারপর গাড়ী থেকে নেমে কপালের ঘাম মুছে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললে, শালার নিকুচি করি আমি ড্রাইভারীর, কি খারাবি যে লেখা আছে তিন তক্তোই জানে। তারপর কি মনে করে বললে– গুরু তুমি ততক্ষণ বাইরের চৌকিটার ওপর বসো, আমি গাড়ীটার চাকা ধুয়ে সাফ করে নেই।

কানা সাড়ে তিন পাঁটকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন খুব সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটিয়ে এসেছে লোকটা। আমার যথেষ্ট কৌতূহল হচ্ছিল, কিন্তু জোর করে পেটের কথা আদায় করা স্বভাব নয় বলেই কিছু জানতে চাওয়ার সাহস হলো না। গামছা দিয়ে মুখ হাত মুছতে মুছতে একসময় সে এসে বললে– চলো গুরু।

তারপর যেখানে নিয়ে হাজির করলো সে জায়গায় আর কখনো আসিনি। খুব অচেনা জায়গা, গলিগুলোও গোলোকধাঁধার মতো। আমরা দুজন একটু আলগা হয়ে ছাদের এক কোণে বসলাম। বোতলের ফরমাস দিয়ে কানা সাড়ে তিন পাঁট বললে– সত্যি বলছি গুরু, আজ তোমার সঙ্গে দেখা না হলে দুঃখে মরে যেতুম। ফিরতে ফিরতে শুধু ভাবছিলুম গ্যারেজে গাড়ীটা রেখেই তোমাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজবো। একটা কথা গুরু, আজ কিন্তু আমাকে সাড়ে তিনের বেশিতে কিছুতেই যেতে দিও না। সাংঘাতিক কিছু... ঘটে গিয়েছে। বেসামাল অবস্থা হয়ে গেলে অগোচরে সব বলে ফেলতে পারি। তুমি আমাকে একটু সামলে রেখ।

সাহস করে বলেই ফেললাম– ব্যাপারটা কি কোনো মতেই বলা চলে না?

– কোনো মতেই না।– এই বলে আমার কানের পাশে সরে এসে ফিসফিস করে বললে– কিন্তু তোমকে সব বলবো, সেই জন্যেই তোমাকে নিয়ে আসা। বিশ্বাস কর গুরু, খোদার কসম বলছি, ততক্ষণ ভিতরের পাথরটা কিছুতেই সরছে না।

তারপর এক নিঃশ্বাসে পুরো একটা গ্লাস সাফ করে বললে– আজ দু'দুটো মানুষ সাবাড় করে এসেছি, একটা অসাবধানে অপরটা ইচ্ছে করে।

আমি চমকে উঠে বললাম– তুমি বলছো কি!

– যা বলছি ঠিকই বলছি। আজ সারাদিন ফুসরত ছিল না, ভোর থেকে প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত মাল টেনেছি, পঞ্চবটি থেকে কড্ডা আবার কড্ডা থেকে পঞ্চবটি, শালার ইট বওয়ার নিকুচি করি আমি।

জানতে চাইলাম– তা মানুষ মারলে কি করে?

– কুকুর বাঁচাতে গিয়ে একটু সাইড নিয়েছি অমনি একজনের গায়ে লাগল ধাক্কা। এ তো শালা আর ব্রিটিশ আমলের তিনটনি ঝরঝরে ছ্যাকড়া কোর্ড নয়, যার নাম মার্শেলাইজ বেনচি, চাকার তলায় পড়ে একেবারে চিড়ে চ্যাপ্টা। মরেছে এখন কি করবো। সটকাবার ফন্দি করছি, এমন সময় দেখি কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে এক শালা পাতিবাবু ঝুঁকে ঝুঁকে লম্বর দেখছে। তক্ষুনি সাব্যস্ত করে নিলুম এই আপদটাকে শেষ করে রেখে না গেলে নসিবে অনেক মন্দ ঘটবে। ব্যস, সিধে এসে

www.nagorikpathagar.org

একেবারে গায়ের উপর চাপিয়ে দিলুম, ব্যাটাচ্ছেলে কেটে পড়বার মতলবে ছিলো, চলে গেল পায়ের উপর দিয়ে। ভয় হলো যদি কোনোমতে ধুঁকতে ধুঁকতে কিছুক্ষণ টিকে থাকে তাহলে নির্ঘাৎ কাউকে না কাউকে লম্বর বাতলে যাবে। মানুষ-জন তখন কেউ কোথাও নেই, ব্যাক করে অনেকটা পিছনে এসে এবারে একেবারে চড়া স্পীডে নাড়িভূঁড়ি মাথামুণ্ডু সব কিমা বানিয়ে রেখে সোজা ঢাকার দিকে চলে এলাম!

আমি বললাম– কিন্তু খুব বড় রকমের অন্যায় করলে এই শেষেরটা!

– কি করবো গুরু, ওটা আমার ওস্তাদের হুকুম। মানুষ খুন করে দোজখে যাওয়া ঢের ভালো কিন্তু আইন-আদালত, ভুলেও ও পথে পা বাড়াচ্ছো কি তোমার রক্ত চুঁয়ে একেবারে গরম পানিতে চোবানো ফ্যাকাসে হাঁস বানিয়ে ছাড়বে।

আমি আর কোনো প্রশ্ন না করে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে চুপচাপ বসে থাকলাম। গোটা দৃশ্যটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। একবার মনে হলো কি ভয়ংকর এই মানুষটা, কি ঘৃণ্য। কি জানি, এরকম কতো মানুষের ভিতরে যে মানুষ নেই কে তার হিসেবের ধার ধারতে যায়।

– গুরু তুমি নিশ্চয়ই আমাকে মনে মনে গাল পাড়ছো, কিন্তু বিশ্বাস করো গুরু, সেই থেকে আমি নিজেও ছটফট করছি। ভিতরে যে কি রকমের অশান্তি তার আর কি বোঝাবো। যাহোক একটা ভালো কাজ করে ওটার শোধ দিয়ে দেবো একদিন।

আমি বললাম,– এইসব অন্যায়ের কোনো ক্ষতিপূরণ নেই, বুঝলে!

এরপর সাড়ে তিন বোতল হবার অনেক আগেই সে ছটফট শুরু করে দিলো। বারবার একই কথা-না হে গুরু, আজ আর বেশিদূর এগুবো না, গতরটাও যেন মানা করছে, কতো হলো আমার?

আমি বললাম,– সবে দেড়!

– বাকিটা তুমিই মেরে দাও!

আমি বললাম– এতো ঘাবড়াচ্ছো কেন?

– কি যে বলো! ঘাবড়ালুম কোথায়। রোজ কি আর একরকম যায়। কানা সাড়ে তিন পাঁট কিছুতেই আর গ্লাস ছুঁলো না। ভাবটা এইরকম যে আমি যেন তাকে ইচ্ছে করেই সাড়ে তিনের ওপর নিয়ে যাবো এবং সে ভয়ংকর রকমের একটা বিপদে পড়বে। কোনো পীড়াপীড়িই শুনলো না সে। বললে-না গুরু, আজ আমাকে জোর করো না, আমার গতরে যেন ঘুণ ধরেছে, যদি বলো সারারাত তোমার সঙ্গে থাকতে হবে তাতেও আপত্তি নেই, কিন্তু ওইটে হচ্ছে না– হ্যাঁ!

তারপর রাত্রি অনেক দূর গড়ালো। একটা অস্বস্তি সারাক্ষণ কুরে কুরে খাচ্ছিলো আমাকে। কানা সাড়ে তিন পাঁটকে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলুম না, মনে হচ্ছিলো লোকটার মুখে থুতু ছিটিয়ে দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাই। কিন্তু থুতু না দিয়ে এমনি পালানোরও কোনো সাহস আমার ছিলো না। কেবলই ভয় হচ্ছিলো যে কোনো অজুহাতে আমি উঠলেই কানা সাড়ে তিন পাঁটের সন্দেহ-প্রবণ চরিত্র একটা

www.nagorikpathagar.org

জান্তব কোপ নিয়ে ছায়ার মতো আমার পিছনে পিছনে ধাওয়া করবে। মঝে মাঝে সে এমনভাবে তাকাচ্ছিলো তার অর্থ আমার কাছে দুর্জ্ঞেয়। ভয়ে ভয়ে স্থাণুর মতো ভাসতে থাকলুম, যেন আমি এই ক্ষীণকায় নিস্তব্ধ মানুষটির কেনা দাস, সে হুকুম না করলে আমার উঠবার কোনো উপায় নেই। সে যদি আমাকে তার পা-ও চাটতে বলে প্রাণভরে আমি তাতেও অমত করবো না। একটু সহজ হবার জন্যেই আমি বললাম– আজকের রাত্রিটা কিন্তু চমৎকার লাগছে। একটা গান ধরো দিকি। কানা সাড়ে তিন পাঁট খুশিতে গলে গিয়ে বললে– গুরুর যেমন কথা। আমি গান শোনাবো কোথা থেকে।

এর মধ্যে ছায়ার মতো দুটো মানুষ তার পাশে এসে বসলো। তারপর একজন কানের পাশে ঠোঁট এনে ফিসফিস করে কি কোথায় সব বললো। আমার কানে গেলো শুধু এইটুকু যে সন্ধ্যে থেকে তাকে গরুখোঁজা করা হচ্ছে।

কানা সাড়ে তিন পাঁট খুশিতে ভেঙ্গে পড়ে লাফ মারার মতো ঠিকরে উঠে বললে– বলিস কি, এই ব্যাপার?

– তবে আর বলছি কি।

– আমি কিন্তু একা যাবো না, আমি যদি যাই সঙ্গে আমার গুরুও যাবে। গুরুকে ছেড়ে আমি একা যেতে পারবো না

– নিয়ে চলো না, বাদ সাধছে কে। বরং ভালোই হলো, আরো একটা লোক বাড়লো। লোক দুটি চলে যাবার উপক্রম করতেই কানা সাড়ে তিন পাঁট তাদের আটকালো। বললে,– সবুর করো, একসঙ্গে যাই মিলেমিশে।

তারপর গড়গড় করে পয়সা-কড়ি যাবতীয় মিটিয়ে দিয়ে আমার একটা হাত ধরে টেনে তুলে বললে– চলো হে গুরু, আজ তোমায় ভুরিভোজ দেবো, একেবারে এক লম্বর জিনিস।

বললাম– একটু খোলসা করে বলো না, ব্যাপার কি?

– রাস্তাঘাটে ওসব আলাপ না করাই ভালো। চলোই না, গিয়ে চক্ষু একেবারে ছানাবড়া হয়ে যাবে, হ্যাঁ।

পথে আর কোনো কথা হলো না। খুব তাড়াহুড়ো করে সে বেবি ট্যাক্সি নিলো। আমাকে সঙ্গে নিয়ে তাতে উঠে সিগ্রেট ঘন ঘন টান মারতে মারতে বাইরের আবছা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলো মুখ বুঁজে। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম আমার মাথা দুলছে, হাত-পাগুলো আলগা হয়ে গিয়েছে, যে কোনো সময় বমি করে ঢাকা শহর এবং মহান রাত্রিটাকে ভাসিয়ে দিতে পারি।

আমরা যখন গন্তব্যস্থানে পৌঁছলাম তখন রাত্রি বারোটা থেকে একটা হবে। কানা সাড়ে তিন পাঁট আমার হাত ধরে নামতে সাহায্য করলো। বললে,– খানিকটা হাঁটতে হবে সামনে, পারবে তো?

বললাম-খুব পারবো। আর তেমন কিছু হলে তুমি তো আছোই।

www.nagorikpathagar.org

– তা আর বলতে। গুরুর জন্যে জানও হাজির আছে, আমি থাকতে একটা আঁচড়ও লাগতে দেবো না তোমার গায়ে।

কতোগুলো এলোমেলো গলিঘুঁজি ঢুঁড়ে সে আমাকে যেখানে নিয়ে তুললো সে দিকটায় মানুষজনের বসতি খুবই কম। এমন একটা রহস্যময় অন্ধকার সেখানে হিংস্র প্রাণীর মতো ওঁৎ পেতে আছে যা শহরের আর কোথাও নেই।

একটা বাড়ির ভিতর ঢুকে, উঠোন পার হয়ে সে কড়া নাড়লো। জানালা খুলে কে একজন দেখলো, তারপর দরোজা খুলে দিয়ে বললে– সঙ্গে কে?

– আমার নিজের লোক।

– চলে এসো।

ভিতরে বড় রকমের দুটো তক্তপোষ ও ঢালাই বিছানা। ইতোমধ্যে প্রচুর বোতল ভাঙা হয়েছে বোঝা গেল। সব মিলে এগারো জন মানুষ যাদের সবাই একটা বিশেষ শ্রেণীর। কারো চোয়ালের পুরু শক্ত হাড় বিশ্রীভাবে ঠেলে উঠেছে, কারো মুখে তারের বুরুশের মতো দাড়ির জঙ্গল, ডুরে শামুকের মতো কারো নখ, কারো পুরু ঠোঁট ঝুলে পড়েছে নিচের দিকে। এক নজরেই খুব একরোখা এবং মারমুখী ধরনের মানুষ বলে সনাক্ত করা যায় তাদের।

কানা সাড়ে তিন পাঁট খ্যাক করে হেসে একজনকে জিজ্ঞাসা করে,– শালার ব্যাটা শালা বোধহয় ঘরে ছিলো না সে সময়?

– ঘরে থাকলে কি আর রক্ষে ছিলো।

একজন বলতে থাকল– এইবার শালার থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিয়েছি।

কানা সাড়ে তিন পাঁট বললে- কজনের হলো?

একজন বললে– এখন ছ নম্বর চলছে।

কানা সাড়ে তিন পাঁট বললে– আমার গুরুকে কিন্তু সিরিয়ালে ফেললে চলবে না এরপরের বারেই ওকে চানস্ দিয়ে দাও।

এবং কিছুক্ষণ বাদে পাশের ঘরের দরোজা খুলে হাসতে হাসতে ওদের একজন ফিরে আসতেই কানা সাড়ে তিন পাঁট আমাকে গুঁতো দিয়ে উঠিয়ে বললে– যাও গুরু যাও, সিধা ঢুকে গিয়ে খিল দাও। সিগন্যাল দিয়েছে।

আমি ভিতরে ঢুকে প্রথমে দরোজাটা ঠেলে দিলাম, তারপর চেষ্টা করলাম খিল দিতে, কিন্তু অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে কিছুই খুঁজে পেলাম না। শেষে পকেট থেকে দেশলাই বের করে জ্বালাতেই সবকিছু নজরে পড়লো। খিল আটকে দরোজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে ডান হাত বাড়িয়ে বাতি জ্বেলে দিলাম, এক কোণে মাদুরের ওপর তালগোল পাকানো শাড়ী কাপড় চোপড় ইত্যাদির পাশে সতেরো আঠারো বছরের একটি মেয়ে। শুয়ে আছে না পড়ে আছে বুঝবার উপায় নেই। সাহস সঞ্চয় করতে একটু সময় লাগলো। প্রথমে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, তারপর উবু হয়ে বসলাম, তারপর চেষ্টা করলাম চুমু খেতে। আমার পা টলছিল। আমার মাথা ঘুরছিল। ক্ষুধার্ত

www.nagorikpathagar.org

কুকুরের মতো আমি তার পা থেকে মাথা অবধি বারবার চাটলাম। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে মাথার ধাক্কায় ঠেলতে ঠেলতে তার নগ্ন দেহটাকে মাদুর থেকে মেঝেয় নিয়ে গেলাম। কতোগুলো অসংলগ্ন প্রলাপের স্রোতে ভাসমান আমার শরীরটা এক সময় অতল রক্তাক্ত আর্তনাদে তলিয়ে গেল।

ঠিক কখন বেরিয়ে এসেছিলাম হিসেব করে বলতে পারবো না। আমার মাথার ঠিক ছিলো না। বেরিয়ে এসেছিলাম প্রচণ্ড শব্দে দরোজা খুলে। কানা সাড়ে তিন পাঁট হেসে বললে– গুরু আমার মতো থার্ড গিয়ার পছন্দ করে দেখছি!

আমি বললাম– আমি চলে যেতে চাই, তুমি একটু এগিয়ে দাও।

– সেকি কথা। একা তো যেতেও পারবে না, যে রকম টলমল করছো!

বললাম– খুব পারবো। তুমি শুধু একটু এগিয়ে দাও। আর কিছু চাই না।

রাস্তায় নেমে বললে– কেমন জিনিস বলো দিখি এখন?

বললাম– ভালো। সকাল পর্যন্ত টিকলে হয়।

– না টেঁকে না টিকবে, আমাদের কি। বাজ পড়লে পড়বে শালা ওই জানোয়ার আলির মাথায়।

তারপর এক সময় আমি একা হয়ে গেলাম। কানা সাড়ে তিন পাঁট ফিরে যাবার জন্যে খুবই উদগ্রীব দেখে তাকে ছেড়ে দিলাম। মনে হলো তার মন থেকে দুটো মানুষ খুন করবার গ্লানি এক অদ্ভুত রসায়নে সবটুকু উবে গিয়েছে। কিন্তু আমি? কানা সাড়ে তিন পাঁট সন্ধ্যায় মনে যে গ্লানি নিয়ে দু'হাতে আমাকে আঁকড়ে ধরেছিলো এই মধ্যরাতে সেই একই গ্লানিতে আক্রান্ত হয়ে আমি কাকে জড়িয়ে ধরবো। সারাপথ হেঁটে, বারবার পুলিশের কাছে সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিয়ে প্রায় শেষরাতে ঘরে পৌঁছলাম। আমি আগের মতোই আবার সব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, সবকিছু শুনতে পাচ্ছি, অথচ আমার সবকিছু হারিয়ে গিয়েছিলো। ঘরের বাধ্য দেওয়ালগুলো আমার গায়ে যেন কিসের একটা গন্ধ পেয়ে থমকে আছে।

'আমর নাম হেনা।'

'হাসনা হেনা।'

'আমার বিয়ে হয়নি। আমার বিয়ে হয়নি।'

'আমাকে মেরো না এমন করে।'

'আমাকে চুরি করে এনেছে।'

'আমার দেশ বিক্রমপুর।'

'আমি কোনো অন্যায় করিনি।'

'আমার ওপর অত্যাচার করেছে অনেকগুলো মানুষ।'

'আমি উঠতে পারি না।'

'রক্তে আমার পা ভেসে যাচ্ছে।'

'আমাকে তুমি মেরে ফেলো।'

www.nagorikpathagar.org

'আমার ভাই আছে।'
'আমার ভাই পড়ে।'
'তুমি আমার ভাই।'
'তুমি আমাকে মেরে ফেলো।'
'তোমরা হাসনা হেনাকে মেরে ফেলো।'
'তোমরা হাসনা হেনাকে জ্যান্ত কবর দাও।'
'রক্তে আমার পা ভেসে যাচ্ছে।'
'তুমি আমার ভাই।'
'রক্তে আমার পা ভেসে যাচ্ছে।'
'রক্তে আমার পা ভেসে যাচ্ছে।'
'রক্ত রক্ত রক্ত রক্ত রক্ত।'

আমি বিছানার ওপর বসে পাশের টেবিলে মাথা রাখলাম। বধির হয়ে জন্মাইনি কেন। কেন স্মৃতিভ্রষ্ট হয় না আমার শ্রবণ। আমি কাউকে চিনি না, কাউকে চিনতেও চাই না। আমি জানি আমার কোনো বোন নেই, না কোনো হেনা, না কোনো হায়েনা। আমি চাই না কারো রক্তাক্ত পায়ে শোকের নদী হয়ে বয়ে যেতে। আমি জানি আমার শরীরেও ছ'জনের অত্যাচারের রক্ত লেগে গিয়েছে, কিন্তু রক্ত রক্ত রক্ত রক্ত রক্ত রক্ত বলে হেনার মতো ছ'বার তা উচ্চারণ করতে চাই না। মনে হলো আর একটু পরেই সূর্যোদয় হবে, আমি মাথা তুললাম টেবিল থেকে, নিজ হাতে জানালা খুলে দিলাম, ভোরের অপেক্ষমাণ অদ্ভুত বাতাস হুড়মুড় করে ঢুকলো। আমি জানালার ঠাণ্ডা লোহার শিকে কপাল ছুঁইয়ে বললাম,– 'হে প্রভাত, তুমি আমার জনক হও, যেহেতু আমি জারজ, গোত্র পরিচয়হীন, আমি চাই তোমার পরিচয়ে সন্তান হতে। হে প্রভাত, হে আমার পিতা, আমাকে আলোড়িত হতে দাও, আমি জানি না কি করে উন্মথিত হতে হয়, ভাষা দাও ভাষা দাও ভাষা দাও!'

'মাগো।'
'আজরাঈল তুমি কি অন্ধ হয়ে গেছ?'
'মাগো।'
'আমাকে শেষ করে দাও, আমাকে শেষ করে দাও তোমরা।'
'মাগো।'
'তোমাদের হেনা যে মরে গেল মা।'
'মাগো।'
'এরা মানুষ নয় এরা শকুন এরা শকুন এরা শকুন।'
'মাগো।'
'আমি শেষ হয়ে যাচ্ছি।'
'মাগো।'

www.nagorikpathagar.org

'মা-আমার মা-মা, মা, মা. এসে দেখে যাও রক্ত রক্ত রক্ত রক্ত রক্ত রক্ত।'

'আমি আমার টেবিলের পাশে আবার এলাম। মনে হলো আজ বছরের প্রথম দিন, স্বচ্ছন্দে অনেক কিছুই বাদ দিতে পারি, ইচ্ছে করলে সূর্যোদয়ের পর থেকে হিসেব করতে পারি নিজের। আমি ভুলতে চাই হেনার কথা। মুছে ফেলতে চাই মন থেকে। আসলে হাসনা হেনা এমনই একটা ফুল যার সৌরভে শুধু ভ্রমরই আসে না, অসে কালসাপও। মনসা, মাগো।

তারপর সূর্যোদয় হলো ১৯৬৫ সালের ১ জানুয়ারিতে। বাসিমুখে একটা বগলা ধরাবার পর সন্তর্পণে খুব নরম ভাবে আমার মনে হলো– এক একদিন আমার চলে যেতে ইচ্ছে করে। সব ছেড়ে, সব ফেলে, সব মুছে দিয়ে এক একদিন আমার ইচ্ছা করে চলে যেতে অনন্তকালের জন্যে। এক একদিন আমার কানে বৃষ্টির তাণ্ডব, জলের উচ্ছল উচ্ছল কলরোল, চোখের নিস্তব্ধ ক্লোরোফর্ম, সপের মতো কুণ্ডলী পাকানো নিভৃত প্রেম কি দুঃসহ যে হয়ে ওঠে। আর একদিন হৃদয় চিরে হৃদয়কে আবিষ্কার করার পাপাসক্ত আয়োজন সারি সারি কষ্টের ফলক ছড়ানো কবর-খানা মনে হয়। মনে হয় যা কিছু দেখেছি– খোলা চোখে কিংবা স্বপ্নে, যা কিছু অনুভব করেছি– রক্তের বিনিময়ে অথবা স্বভাবের তাড়নায়, তার সব কিছুর অন্তরালেই আছে আমাকে প্ররোচিত করা. চলে যেতে। একদিন আমার ভিতরে আলো জ্বেলে দেয় ভয়াবহ অন্ধকার। একদিন আমার ওপরের চামড়া হিংস্র সূর্যালোকে পুড়ে কালো হয়ে যায়। এক একদিন আমি ময়ূর সিংহাসনে সমাসীন কাপুরুষ অথচ লম্পট সম্রাটের মতো ভয়াবহ দিবাস্বপ্নে শিউরে উঠি, যেন মরকত খচিত বিশাল প্রাসাদ অতর্কিত বিস্ফোরণে বিপুল নীলিমায় নিক্ষিপ্ত। এক একদিন শিউরে উঠি পেখম মেলা ময়ূর দেখে, মনে হয় তার পায়ে পাক খেয়ে জড়িয়ে আছে বিষধর সোনালী সাপ। এক একদিন মনে হয় চলে যাই, মনে হয় বঙ্গোপসাগরীয় বাতাসে, বিশাল বিস্তৃত আকাশের কোথাও, কিংবা সুবিস্তীর্ণ সবুজ ধানক্ষেতে মৃত্যু তার নাম লিখে গিয়েছে চুপিসারে। মনে হয় গলিত কু'রোগে আক্রান্ত আকাশের গা থেকে ভয়াবহ আলো খসে পড়ছে, মনে হয় পৃথিবীর সব আগ্নেয়গিরিই সচল আর তাদের গায়ে নাক ঘষে পাক খেয়ে খেয়ে হু হু করে মানুষের দিকে তেড়ে এসেছে বাতাস, জলাস্তীর্ণ ধানক্ষেতের গোপনে গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত কোনো শিল্পীর ভাসমান লাশ ভয়ংকর স্ফীত। এক একবার মনে হয় চলে যাই যখন অতিরঙ্গ মুখগুলোও শাণিত বন্য কৃপাণ হয়ে ওঠে, যখন সত্যের নাভি থেকে স্খলনে অভ্যস্ত মায়াবী বসন জলপ্রপাতের মতো ভূমিতে আছড়ে পড়ে। ইচ্ছে করে চলে যেতে যখন আমার কষ্টের অ্যাসিডে মৃত চরপড়া চোখে ধর্ষিতা– বিধ্বস্ত ট্রয়ের স্মৃতি– করে আর সমুদ্রের নীলরক্ত ক্রূর উল্লাসে উপর নীলিমার দিকে ফিরিয়ে দেয় বজ্রনিনাদ, চলে যেতে ইচ্ছা করে, চলে যেতে ইচ্ছা করে। আর সেদিন চলে যেতে ইচ্ছে করে যখন সারা দেশকে মনে হয় ক্ষত জর্জর মৃত আমার পাগলিনী মায়ের মতো নিরুত্তর পড়ে

www.nagorikpathagar.org

আছে, যেদিন অমি আক্রান্ত হই শকুনের রক্তের এবং চিৎকারের ভয়ে, যেদিন ভিতরের সব নদী অকস্মাৎ স্তব্ধ পাষাণে পরিণত, সেদিন ইচ্ছে করে আমি আমার সব নাম নিজের হাতে মুছে দিয়ে চিরকালের জন্যে আমার কঠিন পিতা সরল পিতামহ নির্মোহ প্রপিতামহ ও ন্যুজপিঠ পলায়নপটু একটি জাতির মতো– তার সভ্যতার মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাই।

www.nagorikpathagar.org

পরী ও বাবরালি

ভুল হয়েছিল বাবরালির, শিকদার কন্টেকদারের কথায় আস্থা স্থাপন করাটা দারুণ গোখুরী হয়ে গিয়েছে তার। এই কনটেকদারের জাতটাকে গত পাঁচ বছরে হাড়ে চিনে নিয়েছে সে, সর্বনাশা পদ্মার ছোবলে বসত জমি সব খুইয়ে শহরে আস্তানা গাড়ার পর থেকেই বলতে গেলে। মুখে মুতে দাও ব্যাটাদের কথার, সে নিজেই বরং সদ্য গাঁ গেরাম থেকে আসা বোকা হাবলা মাঙলা চাষাগুলোকে মদদ জুগিয়ে এসেছে এ যাবৎ, ফুলে ফেঁপে দিন দিন ঘাড়ে গর্দানে যতোই এক হোক না কেন পাওনা রোজ মেটানোর সময় রক্ত-চোখগুলোর গাত্র গুঁহ ব্যামো চাগাবেই। কেবলই শোনা হাতটান আর হাতটান। বিল আটকে আছে, মালের দাম হু হু করে বেড়ে যাওয়ায় অযথা কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা গচ্চা দিতে হচ্ছে, শতেক কেচ্ছা মানে ব্যাবেণ্ডা আর কি। মরলে ব্যাটা বেহেস্ত পাবে না, এ ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ। কিন্তু এত জানা সত্ত্বেও ভুল করে বসেছে সে। শনিবার শিকদার কনটেকদার বকেয়া রোজ সব মিটিয়ে দেবে বলে দেওয়ায় সে একেবারে দু'হাত ঝেড়েমুছে বসেছিল। এমনিতে বহুদিন ধরেই গাথুনির কাজ বন্ধ শিকদারের। সিমেন্ট মাটি না মেলায় এহেন কালদশা। সরকারের ঘর থেকে বরাদ্দের মাল যাও-বা কিছু পেয়েছিলো ধরা করা করে, তার অর্ধেকের বেশি মাঝ পথেই বেলাকে বেচে দেওয়ায় কাম কাজ সব আগে ভাগেই মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছে। পাওনা মেটানোর ব্যাপারে ঢু ঢু উল্টো কেচ্ছা গাউনি ফেঁদে বসলো লোকটা, থাকে বলে সেই পুরনো গ্যাড়াকলা কাঁচ কলা দেখিয়ে ছাড়লো শিকদার শেষ পর্যন্ত, এখন মুলো চোষে।

মোরগ বাগ দেবার আগেই সে উঠে পড়েছিল, হি, হি, হু, হু, করতে করতে খুপরির বাইরে বেরিয়ে দেখে কুয়াশার ফেরে অবলুপ্ত হয়ে আছে বিশ্বচরাচর। মনে হয়েছিল জগৎ সংসারটা এতোই ছোট যে, সে আর তার কাচ্চাবাচ্চার পাল জড়ানো পরিবার ছাড়া সেখানে আর কোনো প্রাণীর বসবাস নেই। কিছুতেই গতরের জাড়

www.nagorikpathagar.org

আর ভাংতে চায় না, জব্বর কাঁপুনি। শীতবস্ত্র না থাকাতেই শীতও পড়েছে একেবারে রাক্ষুসে। এই শীত তার হাড়গোড় নিয়ে পাট কাঠির মতো খেলছে। পায়ছল মেরে কয়েক মাইল পথ অতিক্রম করে তাকে যেতে হবে সেই চিড়িয়াখানার কাছাকাছি। কাটাসুর থেকে মীরপুর সোজা কথা নয়, জাড় নিয়ে হি হি করলে তার চলবে? এক দৌড়ে হাটখোলার পুকুরের কাছে গিয়ে ঘপাং করে পানিতে লাফিয়ে পড়েছিল বাবরালি চোখ, কান বুজে, জাড় জিনিসটা টাকা পয়সাওয়ালা মানুষের মতো, যত খাতির করবে ততো ঘাড় চেপে ধরবে। কব্জ করবে। ঝুড়ি আর কোদাল নিয়ে খুপড়ি থেকে সে যখন বের হয় নূরীর মা তখনো ন্যান্দ্রা গ্যাণ্ডা নিয়ে দলা মোচড়া পাকিয়ে অঘোরে ফোঁস ফোঁস করে ঘুমুচ্ছে, ঠিক যেন সদ্য বিয়ানো একটা ঘুম কাতুরে ভ্যাদাভেদে কুকুর। ঘুমের ঘোরেই মাবুদ মাবুদ করে উঠেছিলো আচমকা নূরীর মা। মাবুদের খেয়েদেয়ে আর কোনো কাম নেই। নূরীর মার জন্যে তার কত না জানি মাথা ব্যথা, এই মেয়ে মানুষ জাতটার মাথায় সত্যিই মুরগীর মগজ। পা দিয়ে নূরীর মায়ের উদোম পিঠে একটা খোঁচা দিয়েছিল। চাটাইয়ের বাইরে দু'চারবার গড়ান খেয়েছে বলে আলগা পিঠটা কেমন যেন সাদা সাদা মালুম হয় বাবরালির। নূরীর মার শোনা না শোনার তোয়াক্কা না করে সে শুধু 'গেলাম গিয়া' এইটুকু বলে বেরিয়ে পড়েছিল চিড়িয়াখানার উদ্দেশে।

অনেকের আগেই সে পৌঁছে গিয়েছিল। গোডাউনের দারোয়ান ছিরুমণ্ডল বসে বসে একটা নধর পাটনাই ছাগলকে কাঠালপাতা খাওয়াচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর থেকেই একটানা অনেকক্ষণ বাবরালির ছাগলটার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে থাকলো। এই রকম একটা ছাগল হয়ে জন্মালে ভালো। ইশ চেকনাই একেবারেই ফেটে পড়ছে। দেড় সের করে দুধ দেয় রোজ, কিন্তু ইদানীং বাগড়া দিচ্ছে, সাপখোপে তলে তলে বাঁট চুষে যায়, ছিরুমণ্ডল চোয়াল শক্ত করে একটা আক্ষেপ জোরে। বাবরালির মনে হলো শালার এই আদম চাড়াল না হয়ে একটা হিলহিলে কুচকুচে সাপ হয়ে জন্মালেও ঢের ভালো ছিলো। এণ্ডারসে গেরেস্থের কনটেকদারগুলোকে দাঁতে কাঁটো, দিব্যি ল্যাজে ল্যাজে ফাঁস এঁটে আরামসে দুনিয়াদারির সুখ লোটা যেতো। গরু-ছাগল সাপ-ব্যাঙ ছুচো ইঁদুর তার থেকে অনেক সুখে আছে, মনে হয়েছে বাবরালির। খোয়া ভাঙা, মাটি কাটা, ইটা বওয়ার এই যে উদয়াস্ত ভূতের বেগার খেটে আসছে, ক্ষুণ্নিবৃত্তির নিরাপত্তাটা কোথায়। গতর তার পুঁজি। এই পুঁজি ভাঙ্গিয়ে খাচ্ছে সে। এ আর কত দিন। এ পুঁজিতেও এক সময় টাল পড়বে। ঘাটতি দেখা দিয়েছে এখনই। মস্ত বড় আকাশে সূর্য ঝলসে উঠেছিল এক সময়। খেয়াল করেনি বাবরালি। ঝলসানো সূর্যের আবির্ভাবের চেয়ে কনটেকদারকেই তার বেশি প্রয়োজন। সকলেই হাজির হয়ে গিয়েছিল ইতিমধ্যে। গা জড়াজড়ি করে লাইন বেঁধে বসে সবাই যেন চেহলামের বিরাট একটা গুরুর গোশ দিয়ে গণ্ড পিণ্ডে একটা দারুণ মওকা। হঠাৎ করেই হুটোপুটি শুরু হয়ে গিয়েছিল। ঐ তো শিকদারের জীপ গাড়ী, ঐ তো কনটেকদার।

www.nagorikpathagar.org

গাড়ি থেকে নামলো শিকদার, সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব। নেমেই ধা করে একেবারে সিধা ইটের পাজার ক'ছে দাঁড়িয়ে পেচ্ছাব শুরু করলো। উস্কোখুস্কো চেহারা, লাল চোখ, সারা রাত বেদম মাল টেনেছে, বুঝতে দেরী হয়নি বাবরালির। বোতাম লাগাতে লাগাতে ফিরে এলো আবার। এসেই চাটাং করে গালে একটা বিরাশি শিক্কার থাপ্পড় বসানোর মতো করে বললে, 'একেবারে মেলা বসে গেছে শালার, সব শালার ফকিরের ছাওয়াল, যা পাবে সব কাছে ভরবে, সব খেয়ে ফেলবে বসে। কিছুক্ষণ পর নীরবতা ভঙ্গ করে আবার বললে' 'পেমেন্ট হবে না আজ, টাকা পাওয়া যায়নি, সামনের বুধবার হলেও হতে পারে– '

একযোগে সকলেই ভয় ভয় করে উঠলো, যেন থ্যালথেলে গোবরগাদার একটা আধটা ইট এসে পড়ছে। শিকদার পাগলা কুত্তার মতো খাউ করে খেকিয়ে উঠলো, টাকার গাছ আছে নাকি আমার এ্যাঁ? চুপ রাও সব, না পেলে কোত্থেকে দেবো এ্যাঁ? খালি হাউকাউ। যাও সব দেখা যাবে সামনের বুধবারে– '

কোদালের এক ঘায়ে মুণ্ডুটাকে আলগা করে ফেলতে পারলে গা জুড়াতো বাবরালির। কোনো তোয়াক্কা না করে হারামখোরের ব্যাটা যেভাবে এসেছিলো সেই ভাবেই গদাই লস্কর চালে গাড়িতে উঠে চুপ করে চলে গেল। যাবার আগে শুধু ছিরুমণ্ডলকে চাপা গলায় কিছু একটা বলে গেলে।

হাতেম আলি বাবরালির জাতি ভাই, বয়সে বড়, সেই ভিড়িয়ে ছিলো বাবরালিকে শিকদারের কামে। গামছার খুট দিয়ে চোখ মুছতে লাগলো হাতেম আলি। শেষ পর্যন্ত ডুকরে কেঁদে উঠলো ভেউ ভেউ করে। কাঁদতেও পারে বুড়োটা যেন ওটাই এখন ওর ডিউটি। সকলের হয়ে তাকে কাঁদতে হবে হাউমাউ করে।

ঘাড় গুঁজে বসে থেকে আর লাভ নাই। মাথাটা ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে বাবরালির। এখন উপায়? পুরি পাল্লা ভার বিরাট গত পাঁচ বছরে পাঁচ বার বিইয়েছে নূরীর মা। এক আধটা মরে হেজে গেলেও না হয় কথা ছিলো, আগের ঘরের ছেলে ফজলু সহ মোট আটটা পেট এখন দাঁতে মাটি কামড়াও। পেট তো নয়, যার এক একটা রাক্ষুসে জ্বালা। ইচ্ছে করে পটাপট মাথার চুল ছিঁড়তে দু'হাতে। দানা পানি নেই ঘরে দু'দিন থেকে। জোড়াতালি আর গোজামিল দিয়ে মিলেঝিলে রাক্ষুসেগুলোকে কোনো মতে সামলে রেখেছে নূরীর মা। বাসায় বাসায় ছুটকো কাজ করে সে। বাসনে করে নিজের খাবার কিংবা ভাত এটোকাটা হলে নিয়ে আসে। তা ওটা আর কতটুকু, কি-ইবা এমন হয় তাতে? উপোস নিয়ে নিয়ে চিমসে মেরে যাচ্ছে মেয়ে মানুষটা কালো হাড়ির মতো মুখ, কথা বললেই মুখ ঝামটা মারে– মা'বুদে চক্ষু খায়া বইছে, ক্যান যে আমারে লয় না– এটা তার বাধা বুলি।

চড়বড় করছে রোদ্র। সাদা ধবধবে রৌদ্রে যেন বিন্নীধানের খই। গরম মচমচে খই। ভাজনা খোলা থেকে চিটপিট চিটপিট করে ছিটকে পড়ছে। খুব খেতে ইচ্ছে

www.nagorikpathagar.org

করছে বাবরালির। টাকা না পেয়ে নাড়ি ভুঁড়ি মোচর মারা শুরু করেছে, সর্বগ্রাসী প্রচণ্ড এক খিদেয় হাঁ হাঁ করছে তার ভিতরটা।

ন্যাণ্ডা গাণ্ডা আর নূরীর মা'র ধারালো মুখচ্ছবি কল্পনা করে প্রতিটি পদক্ষেপ ছোট হয়ে আসে বাবরালির।

পিঠের ওপর ওল্টানো ঝুড়ির আর কাঁধের কোদালের ওজন দুই মন এখন। কোদালের ঝকঝকে ফলায় রোদ্র ঝিলিক মারছে, ঝলসে উঠছে তার গায়ের একটা পিঠ।

রাস্তা ছেড়ে একটা মাঠের ধার ধরে এগোতে থাকে বাবরালি। টাকাটা না পেয়ে দুনিয়াটাই তার কাছে মিথ্যে হয়ে গিয়েছে। এইভাবে ধুকে ধুকে বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না। বেঁচে থাকার জন্যে একটা মানুষের জীবনে কতো কিছুর যে প্রয়োজন তার আর কোনো ইয়ত্তা নাই। হাঁটতে হাঁটতে কালি ঝুলি মাখা মুখের মতো অনেক কিছুই উঁকি দেয় তার মনে। এই যে সে হেঁটে চলছে যে জমিটার উপর দিয়ে, এটা কার? বিরাট ময়দান, এখানে ওখানে ঠায় দাঁড়িয়ে তাল গাছ আর কাঁঠাল গাছ, মুপচি ঝোপ, আলকুশির ঝোপ, এখানে-সেখানে। কতো জমি যে এভাবে অবহেলায় পড়ে আছে। বাবরালি মনে মনে উল্লসিত হয়, এ জমি তার হাতে এলে চাষ করা কাকে বলে সে দেখিয়ে দিতো। শুধু ধান আর ধান। ধানের পাহাড়ের বুকে ভুশ ভুশ করে লাফিয়ে বেড়াত বাবরালি। এদিকটায় মাটি কেমন যেন লাল, উর্বর। মাঠ-ঘাট সব কিছু নিখর। দু'একটা পাখি ফিঙে কি দোয়েল থেকে থেকে চিৎকার করছে। একপাশে জলা। বাবরালি জলার দিকে এগোয়। হুশ করে একটা মাছরাঙা উড়ে গেল, জলার গায়ে একটা কঞ্চির উপর ঘাপটি মেরে বসে ছিলো এতোক্ষণ, বড় সাবধানী। মাছরাঙার গোশত সম্ভবত সুস্বাদু– এইবার মনে হয় বাবরালি, আধলা ইট ঝেকে পাখিটাকে ছাতুছালা করে যেত সুযোগ পেলে। তার পর হাতে ঝুলিয়ে ঘরে ফিরতো।

জলাশয়ে থমথমে চেহারায় বিগড়ে যায় সে। পানি থিতিয়ে আছে। একটু আগে ভেবেছিলো কিছুক্ষণের জন্য বসবে এখানে, জিরিয়ে নেবে। পানির তিরতিরে থির চেহারা তার কখনই ভালো লাগে না। দুনিয়ার মুখে মারো ঝাড়ু, কটকট করতে থাকে বাবরালির মাথার মগজ। রগে টান ধরেছে, ছিঁড়ে যাবে কটাং করে। ক্রমাগত একটা চাকা বন বন করে ঘুরছে মগজের ভিতর। যার কয়েকটা স্পোক ভাঙ্গা। এই দিগন্ত বিশাল মাঠটা যেন গপ্‌গপ্ করে ব্যাঙ গেলা করছে তাকে।

পাশে একটা কুল গাছের ঝোপ দেখে কিছুক্ষণের জন্যে থামলো সে। হাত বাড়িয়ে ইচ্ছেমতো কুল পাড়লো। ধারে কাছে কেউ নেই, কারো বাপের সম্পত্তি নয়। হাঁটতে হাঁটতে দাঁতের মাড়ি দিয়ে মটামট করে কুলের দানা ভাংতে থাকে সে, যেন একটা কাজ পেয়েছে এই মাত্র। খোলা ভাঙ্গাই এর কাজ। কষা কুল। গলা টেসে যাচ্ছে।

www.nagorikpathagar.org

জলাশয় পেছনে ফেলে বহুদূর এগিয়ে যায় বাবরালি। ময়দান প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সামনেই ঝকঝকে চওড়া রাস্তা। একবার ভাবলো পা চালিয়ে ধারে পিঠের একটা বাজার ঘাটে গিয়ে ঝাঁকা মুটে গিরী করে যা হোক কিছু কামাবে, কিন্তু তেমন যেন উৎসাহিত হতে পারলো না। দারুণ নেতিয়ে পড়েছে সে ভিতরে ভিতরে, শালা কনদেকদারের বাচ্চা একেবারে খুন করে দিয়েছে তাকে। বড় রাস্তা ধরে পা চালাতে চালাতে শেষ পর্যন্ত একটা জমজমাট বাসস্ট্যাণ্ড গিয়ে পৌঁছলো বাবরালি। পেট্রোল পাম্পের কোল ঘেঁষে এখানে ওখানে চা বিস্কুট আর পানের দোকান। পানের দোকানের ট্রানজিস্টারে চিনচিন করে ভাটিয়ালী গান হচ্ছে। অপেক্ষমাণ যাত্রীরা ফুঁক ফুঁক করে সিগারেটে টান মারছে।

ছিমছাম মানুষজন, ফিঁকে কোলাহল, পেট্রোল পাম্পের ঝকঝকে কাঁচ সবকিছু এক নিরুদ্বিগ্ন জগতের দরজা খুলে দেয় তার সামনে। বসতে ইচ্ছে করে বাবরালির। বাবরালি বসে পড়ে। অবসাদে, হতাশায় এবং অনমনীয় দুঃখবোধে রি রি করতে থাকে তার সর্বাঙ্গ। নূরীর মার দাঁতে দাঁত চাপা চেহারা এই মুহূর্তে তাকে পীড়া দেয়। নিজেকে এমন বিপন্ন এমন মেরুদণ্ডহীন অসক্ত অক্ষম মনে হয় যে মাথা পর্যন্ত তুলতে পারে না সে। মাবুদ কেন যে নেয় না বেটিরে। এই বেটির জ্বালাতন সবচেয়ে অসহ্য। হাতে টাকা গুঁজে দাও অমনি ঝলমল করে উঠলো, যেন চাঁদের আলো গলা তরতরে নদী। যখন ট্যাক বেড়ে ফুটো কড়িও পড়ে না তখনই দেখা যায় বেটির আসল চেহারা। বাচ্চাকাচ্চা তো নয়, সব শুয়োরের পাল। চৌপহর দিন কেবল খাই খাই করে বেড়াচ্ছে। কিছু না পেলে গায়ের ছাল চামড়া ছিঁড়ে খাবে।

পেটে পা দিয়ে চটকে একটা একটা করে সব কটাকে যদি যমালয়ে পাঠানো যেত। ভালো লাগে না বাবরালির। নূরীর মা'র আজকের চেহারা খুব সহজেই কল্পনা করতে পারে সে। ক্রমশ ঝিম ধরে তার। একেবারে কাঁদার পুতুল হয়ে যায় বাবরালি। তারপর এক সময় কেউ যেন তার ভেতরের ডাল পালা ধরে নাড়া দিতে থাকে। প্রচণ্ড ক্ষোভে সে নড়েচড়ে বসে, নিদারুণ বিদ্বেষে আর একটু পরেই সে যেন ফেটে পড়বে। কেন যেন এই মুহূর্তে বাবরালির মনে হয় তার উপর নূরীর মা'র কোনোই সহানুভূতি নেই, কখনো ছিল না, এখনো নেই। বেটি জানে শুধু নিজের দিকটাই। নিজের খাটুনি, নিজের দেখতে কষ্টটাই তার কাছে চিরকাল বড়ো।

হঠাৎ নূরীর মা'কে দারুণ রকমের একটা শিক্ষা দেবার অভিপ্রায়ে প্রায় হন্যে হয়ে পড়ে বাবরালি। এইবার থেকে গা ঢিলেমি দিতে হবে। চোখ মেলে সে কোনো দিকে তাকাবে না, উচ্ছন্নে যাক, নিপাত যাক শুয়োরের পাল, গলা চিড়ে রক্ত বেরুক, আর কোনো দিকে তাকাবে না বাবরালি।

পোলাডারে গোর দিমু... বাবরালি বাসস্ট্যাণ্ডের মানুষ জনের কাছে হাত পাতে। কি সময়, দাফনের পয়সা নেই।

www.nagorikpathagar.org

বাবরালির জবুথুবু এতোক্ষণ বসে থাকাটা অনেকের নজর এড়ায়নি। অস্বাভাবিক তার কার্যকারণ খুঁজে পায় অনেকেই। সহানুভূতি কিনা কে জানে, দু'চার জন কিছু কিছু দিলে বাবরালি বুঝতে পারে জুতসই লাইন পেয়ে গেছে সে, আল্লা মিলিয়ে দিয়েছে, তাই রপ্তে রপ্তে সুর বদলাতে থাকে তার– রাখবার পারলাম না পোলাডারে। ছাইড়া গেল গা, পারলাম নারে...

বাসস্ট্যাণ্ডে কাদুনি গেয়ে গেয়ে অনেকক্ষণ কাটলো তার ছ'আনা আট আনা হবেই। আর নয়। বাবরালি এবার রাস্তা মাপে। সন্দেহের চোখে দেখছে সবাই। পুনরায় হাঁটা শুরু হয় বাবরালির। সামনে সামনে মানুষ পড়লেই সে হাত পাতে, গালাগাল দেয় অনেকেই। এ আর এমন কি, উত্তরোত্তর কেমন যেন বেপরোয়া হয়ে পড়ে সে। এ যেন তার সেই কত দিনের পুরনো পেশা, এ-ই তার জীবন। এখন তার গায়ে গণ্ডারের চামড়া। নিজের সব পরিচয় খুলে ফেলেছে বেমালুম। পরিচয়ে কি হয়, পরিচয় নিয়ে কি ধুয়ে খাবে।

গায়ে ছাই ওড়া নূরীর মা-ও হামলে পড়া এক পাল রাক্ষুসে এণ্ডা বাচ্চার কথা ফাঁকে ফাঁকে মনের কোণে উঁকি মারলেও এখন আর তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না বাবরালির। সারা দুপুর ভিক্ষে করে বেড়ালো সে। ক্রমশ বেলা পড়ে আসে। সেই কখন বিকেল ঢলে পড়েছে। খিদের কথা ভুলেই ছিলো বাবরালি। পেটের নাড়ি চোঁ চোঁ করছে। বাজারের ধারে বটতলার হোটেলে বসে পেট ভরে গরুর গোশ দিয়ে ভাত খেল সে। গরুর গোশ আর মটরের ডাল। এরা বেশ ভালো রাঁধে, তেজপাতার গা থেকে ডালের রস চেটে খেতে খেতে বার বার খানিকটা করে সুরুয়া চেয়ে নেয় সে, ডেকচি ভর্তি সুরুয়া, টুকটুকে রঙ, যেন ডেকচির ঐ সুরুয়ায় সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

প্রাণ ভরে খেল বাবরালি। এখন আর তার মনে কোনো খেদ নেই। ইচ্ছে করলেই যে কোনো লোক অন্তত নিজের একার ভার ঠাণ্ডা করতে পারে, সে বিষয়ে এখন আর তার কোনো সন্দেহ নেই। ট্যাকে এখনো একটা সিকি পড়ে আছে। সিগারেট জ্বালালো সে। ভর পেটের আলস্যে দু'চোখ বুজে আসতে চায় বাবরালির। ঠেলাগাড়ীওয়ালারা বসে বসে তাস পেটাপিটি করছিল। বসে পড়লো একপাশে বাবরালি, মৌজ করে সিগারেটের ধোঁয়া গিলতে গিলতে খেলা দেখতে থাকে সে।

২.

ইচ্ছে করেই অনেক রাতে ঝুপড়িতে ফিরলো বাবরালি। তেমন কোনো সাড়া শব্দ নেই ঝুপরির ভেতরে, কেবল রহস্যময় অপার নিস্তব্ধতা নদী হয়ে বয়ে চলছে। তার মাথা সতর্ক মাছের মতো খলবল করে উঠে ভয়। দাগী আসামী, ধরা পড়ে যাবে যে কোনো মুহূর্তেই। ন্যাণ্ডপাণ্ডারা বুঝিবা ঘুমিয়ে পড়েছে। আপাতত তাই মনে হয়,

www.nagorikpathagar.org

অকারণে গলা খাঁকারী দেয় বাবরালী। কিছুক্ষণের মধ্যেই নূরীর মা বেরিয়ে আসে। বাবরালি কিছু বলার আগেই জিজ্ঞেস করে "ছিলো কই?"

নিরুত্তর বাবরালি সুড়সুড় করে ঘরে ঢোকে পাশ কাটিয়ে, ঝাঁকা আর কোদাল এক পাশে রেখে সবিস্ময়ে ঘুমন্ত পুরি পাল্লার দিকে তাকিয়ে থাকে।

নূরীর মা খুব কাছে এলো। সাগ্রহে বললে... খাওন রাখছি। আতউত ধুয়া এলা খায়া লও... খুশিতে উপচে পড়ছে নূরীর মা। দূরে আলোকসজ্জায় উদ্ভাসিত বিয়েবাড়ি দেখায় বাবরালিকে। এক গামলা বিরিয়ানী মেঙ্গে এনেছে সে। এণ্ডা বাচ্চাদের খাইয়ে দিয়েছে বহু আগেই।

'খাওনের ইচ্ছা নাই, তুমি খাইছ?'

'হ–'

'বালা করছো। অহনে হুমু আমি। হুমুদ্দির পো আজও ট্যাকা দেয় না; দিনটা যা গ্যাছে– '

খাইলেই পারতা, কি মনে করে নূরীর মা আবার বললে, হইবে নে পরেই খায়ো। একডা কতা– নূরীর মা প্রায় কানে কানে বাবরালিকে কি কোথায় সব বলে।

'কও কি– ' বাবরালি মাটির ওপর জাবড়ে বসে বললে– 'কই দেহি দেহি।'

'সবুর, পিন্দা দেহামুনে। নূরীর মা কোলের বাচ্চার পাশে কাত হয়ে মুখে স্তন দিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে তাকে। বাচ্চাকাচ্চারা অকাতরে ঘুমুচ্ছে। একপাশে একটা চাটাইয়ের উপর কাত হয়ে নূরীর ম'র কাণ্ডকারখানার কথা ভাবতে থাকে বাবরালি। নদীর ধারে ইট খোলা, ঘুপসি ঝোপে একটা বড় ঘরের মেয়ে মানুষকে খুব করে বস্ত াবন্দী অবস্থায় কারা না কারা... । নূরীর মা চুপি চুপি খুলে ছিলো সেটা, ধড় আর মুণ্ডু আলাদা, পরনে ফুলের ছাপ মারা বাহারে সিল্কের শাড়ি। ধারে পিঠে মানুষজন না থাকায় বহু চেষ্টা করে বহু কষ্টে, গা থেকে শাড়িটা খুলে এনেছে সে। গা-টা ছমছম করতে থাকে বাবরালির। নিচু গলায় সে বললে 'কামটা ভালো অয় নাই নূরীর মা, মাইনসে দেইখা থাকলে– '

'দেহে নাই আমারে। আওনের সময় হিঞ্চা দিয়ে ঢাইকা লই আইছি।'

'কিন্তু পিনবা ক্যামনে, মাইনসে দেখবো না– '

'মাইনসে দেহার কেডা। তুমি দেখবা। মইধ্যে মইধ্যে রাতে পিনমু। তুমি দেখবা' নূরীর মা'র গলা নদী হয়ে যায়। এ কথায়, বাবরালি একটা ফুটো নৌকার মতো ডুবে যায় তার ঠাণ্ডা হিম তলদেশে। দূর থেকে পিটপিট করে দেখতে থাকে সে নূরীর মাকে।

'বড় খারাপ দিনটা গেছে আজ– '

নূরীর মা নরম গলায় বললে,– 'কি আর করবা?'

'আমাদের যে কি অইবো, বুঝবার পারতাছি না।

কিছু বুইজা কাম নাই, অহনে এলা মোরে পিঠ দিয়া শোও, পিন্দা দেখাই– '

www.nagorikpathagar.org

নূরীর মা'র দিকে পিঠ ফিরিয়ে ঘুরে শোয় বাবরালি। শাড়ির খসখসে শব্দে নিস্তব্ধ রাত্রির ক্ষণ শিউরে ওঠে। চোরা চোখে নূরীর মা'র ঘুরে ঘুরে শাড়ি পরা দেখতে থাকে বাবরালি, অনাস্বাদিত তীব্র মধুর উত্তেজনায় তার সারা শরীরে শিরশির স্রোত বয়ে যায়। সবুজ জমিনের শাড়ি, তাতে থোকথোক হলুদ ফুলের ছাপ। এখানে ওখানে রক্তের ছোপ দেয়া। কুপির পিটপিটে আলোয় অদ্ভুত দেখায় নূরীর মাকে। যেন থোকা থোকা লাল আর হলুদ ফুল কামড়ে পড়ে সবুজ নিস্তব্ধ বাগান; এমন বাগান বহুবার লোহার গেটের ফাঁক দিয়ে বাবরালি দেখেছে।

আজ থেকে পাঁচ ছয় বছর আগের কথা মনে পড়ে যায় বাকরুদ্ধ প্রায় বাবরালির। যখন নূরীর মা'র বয়স ষোল কি সতেরো। ওর একটা নাম ছিলো। বড় মিষ্টি সে নাম। কি আশ্চর্য, এতদিন সে ভুলেই ছিলো। বাবরালির মনে হলো অলৌকিক জোছনার বাঁধ ভাঙ্গা প্লাবনে তার ঝুপড়ির ভিতর এবং বিশ্বচরাচর ভেসে যাচ্ছে। নরোম গলায় আদর করে সে ডাকে– 'পরী আয় কাছে আয়...'।

www.nagorikpathagar.org

গরু ছাগলের গল্প

আয়নল মাস্টার বললে, 'ঠিক বুঝলাম না বাপু, কেন হঠাৎ এরকম সুর বদলালো, অথচ কালকেও কথা হয়েছে, ওরা নানা রকমের ভরসা দিল, বললে হাজার হোক সবাই নিজ গ্রামের লোক, বিপদআপদ সকলেরই আছে, ওদের বলুনগে নিশ্চিন্ত থাকতে। কোনো উটকো কথায় কান দেবার দরকার নেই, সব গুজব। আর আমরা এখানে থাকতে ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খেতে কেউ আসবে, অমন লোহার বাজার এখানে কার আছে–

সকলে অধীর আগ্রহে আয়নল মাস্টারের মুখের দিকে তাকিয়ে। কারো মুখে রা নেই; দুশ্চিন্তার ভারে একেক জনের চেহারায় তা তো লেগেছে মরণাপন্ন জটিল রোগীর। হ্যারিকেনের আলোরও একটা ভূমিকা আছে এখানে। গুব গুব করে সকলের বুক, আলোটা হাসছে হা হা করে, বিপদ ডেকে আনছে ইচ্ছে করে, গা পেতে। আজকালকার বাতিগুলোর এই এক খচড়ামী, নিজের মর্জি মতো বাড়ে কমে। একটু জিরিয়ে নিয়ে আয়নল মাস্টার আবার বললে, মানুষের মতি-গতি জিনিসটাই এমন ধারার। তা খুব কম দেখা হলো না জীবনে; হয়তো কেউ নিছক নিজের স্বার্থ উদ্ধারের মতলবে বদমাসগুলোকে তলে তলে উস্কে দিচ্ছে, কাঁধের ভূত যে নামাবে, হয়তো ওদের নিজেদেরও সে সাধ্যি নেই কিংবা আরো বড় লোভ দেখিয়েছে, ওরা সেই টোপ গিলেছে।

এ আক্ষেপে উরুক্কু উরুক্কু চেহারার উঞ্ছ ভাজা লোকগুলোর চোখে-মুখে স্পষ্টতই ধস নামে। সকলে এমন মূর্তিমান আগ্রহ নিয়ে এই সাদা ধবধবে দাড়িওয়ালা বুড়ো মানুষটির দিকে তাকিয়ে ছিল, লোকটি যেন অলৌকিক জাদুকর, একটু কৃপা করলেই চোখের পলকে যাবতীয় সংকটের মোড় ধাই ধাই অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে পারে। এখন বোঝা যাচ্ছে, এই মানুষটির নিজের বিশ্বাসই চিড়-খাওয়া। এই সব কথাবার্তা শুনে মনে হয় তারা নিছক বিশ্বাসের উপর ভর করে, অমন একটা লোককে মোড়ল করেছে, যার নিজের দম ফুরিয়ে এসেছে তারা বুঝতে পারে, এই সব ছেলে বেলে হা হুতোশ একটু একটু করে তাদের শরীরের তাপ শুষে নিচ্ছে। বিরক্তি আশঙ্কা ভয়

www.nagorikpathagar.org

চার পাশ থেকে হুল ফোটাতে থাকে। আসলে লোকটি স্রেফ কথার মোড়ল অকর্ম্মার ধাড়ী।

গলায় জড়ানো গামছার পাক খুলে মুখ মুছে আয়নল মাস্টার বললে, কতো রকমের যে কথা সেসব শুনে মাথা ঠাণ্ডা রাখা কঠিন। প্যাঁচ আর প্যাঁচ। কাল যখন টাকার বাণ্ডিলটা হাতে দিলাম, তখন গুনেও দেখলো না কতো। বললাম, বাবারা, নিজেদের হাতে ভালো করে গুনে নাও। তখন ক্যাল ক্যাল করে হেসে বললে, উনিশ বিশ হলেই হলো। আজ ধরেছে আবার উল্টো সুর, তোমরা হাজার টাকা দিয়েছ না তার বেশি, এই নিয়ে ঘোরতর সন্দেহ। সে কত রকমের জেরা, জেরার ঠেলায় অন্ধকার। বললে, টাকাটা তো আপনার হাতে তুলে দিয়েছে রঘুপাল, আপনি কি করে জানলেন ভালোমানুষের মতো সবটাই আপনাকেই দিয়েছে? এ তো আর তার বাপের ঘরের টাকা নয়, দশ হাতের চাঁদা কিছু হজম না করে এমনি দেবার পাত্র সে নয়। রঘুকে আমরা খুব ভালো চিনি, আপনি বলতে চান ভিতরে ভিতরে ভোটাভুটির সময় গাঁট গচ্চা যায়নি তার? ইচ্ছা করলেই আমরা প্রমাণ করতে পারি ও ইণ্ডিয়ায় টাকা পাচার করে। আমি বুঝিয়ে বললাম, তোমরা তো হাজার টাকাই দাবী করেছিলে বাপু এখন আবার প্যাঁচ কষা কেন? রাতারাতি সুর বদলে ফেলেছে আলি আহম্মদ। বললে তখন এক হজার টাকা দাবী করেছিল হিসেব পত্তর না করেই। এখন আমাদের হাতে আছে বাগুইসারের গোয়াল ব্যাটাদের মালামালের জ্যান্ত মর্দা কাজলী আর বকুল মিলে ১৫ গণ্ডার মতো গাই গরু, মন বিশেক পিতল কাঁসা দু'শো ভরি সোনা, গণ্ডায় গণ্ডায় মেয়ে মানুষ।

রঘুপাল চাপা গলায় বললে, 'ওসব থাক, এখন বলুন কি করা যায়।'

আয়নল মাস্টার নিজের ভুল একটু দেরীতে বুঝতে পেরে লজ্জিত হয়। গা আড়াল করে যে ঝাঁক বেঁধে মেয়েরা ধারেকাছেই আছে, এ খেয়াল তার ছিল না। হড়বড়ে স্বভাবের মানুষ, বয়সকালে রসবাতের মতো আহাম্মকি কখনো পেয়ে বসে। দু'একবার অনাবশ্যক কাশি ঝেড়ে নিজেকে সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে বৃদ্ধ।

জন চল্লিশ লোকের ভিড়, তপা ঘোষের বয়েস একটু ছোকরা গোছের, সে ঢাকার জগন্নাথ কলেজের আই কম এর ছাত্র। সম্ভবত তপা ঘোষ বললে, এটা একটা অন্যায় জুলুম।

রঘুপাল থামিয়ে দিয়ে বললে, 'জুলুম নয় তো কি। তা নইলে আমাদের ওপরে হামলার কথা ওঠে কেন, আমরা দলের কেউ নই না কি?

ওরা বিহারী হলে একটা কথা ছিল, এক বাঙালি ভাই আরেক বাঙালি ভাইয়ের ওপর অকারণে জুলুম চালাবে এর মানেটা কি? তাহলে দেশের স্বাধীনতার জন্যে এতোসব ঝক্কি পোহানোর দরকারটা কি? দেশের লোক রক্ত দিচ্ছে না? কাদের জন্যে নিচ্ছে? কিসের জন্য দিচ্ছে?

রঘুপাল মুখ ভেংচে বললে, তাহলে তুমি বসে বসে এখানে লম্বা লম্বা লেকচার মারো, আমরা উঠি,– আয়নাল মাস্টার বললে, 'মাথা গরম হবারই কথা। ছেলে মানুষ, কচি প্রাণে ঘা লেগেছে।'

www.nagorikpathagar.org

'তুমি বাইরে যাও তো।' রঘুপাল খারাপ মেজাজে বললে, 'কাজের কথা ফেলে স্রেফ ফালতু কথার ঘোঁট পাকানো– '

তপা যা তুলেছে, তা উপস্থিত সকলেরই মনের কথা। ভেতরে সবাই ক্ষুব্ধ কিন্তু ঐ পর্যন্তই। কারণ কিছু করার নেই, সবদিক হাত পা বাঁধা, নিজের গ্রামে নিজের বাড়িতে এরকম চোরের মতো বাস করার মতো ঘৃণ্য আর কি আছে। তপা উঠে যাওয়ায় ঘরের আবহাওয়া আরো গুমোট হয়ে ওঠে।

কেউ একজন ফিসফিস করে বললে, জৈনসার ছাতিয়াতালির দিকেও শুনতাছি কিছু একটা হইছে আইজ।'

'কোত্থেক যে তোমরা পাও এসব।' রাগের মাথায় রঘুপাল একটা সিগ্রেট জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে বললে, কিছু একটা ডিসিশন নিতে হয়। আপনি কি সাজেস্ট করেন?

আয়নল মাস্টার বললে, আমার দৌড় তো তোমরা দেখলেই বাবা। কে কারে খাতির করে এখন। গণ্ডায় গণ্ডায় সব ছোকরা মাতব্বর বেরিয়েছে, যে যার খেয়াল খুশি মাফিক এক একদিন এক এক ফতোয়া ঝাড়ছে, তাই নিয়েই সব নাচানাচি, কাজের কাজ কারো দ্বারাই হয় না–

রঘুপাল কপাল কুচকে বললে, 'আপনি কি মনে করেন হামলাটা আজ রাত্রের মধ্যেই আসবে?'

'ঠিক বোঝা গেল না ওদের ভাব। সাবধান থাকাই ভালো– '

মাঝ বয়েসী মুকুন্দ সদগোপের ডান পায়ে দগদগে নালী ঘা। অবহেলার দরুন যা হয়, এখন শতেক রকমের তোয়াজ করেও দমন করতে পারছে না। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে একপাশে বসে সে এতোক্ষণ নিজের পায়ের পাতায় হাত বোলাচ্ছিল। লোকটি একটু মুখফোঁড় স্বভাবের। বললে, 'নতুন করে টেকার বায়না ধইরা থাকলে কয়া ফালান মাস্টার সাব, নিজেগ যখন অগো ঝোলায় বন্ধক দিছি– '

'কপালের ফের তো এ্যারেই কয়' বিশু ঘোষ সমর্থন করে বললে, 'মান ইজ্জতের লাইগা ভিক্ষা কইরা হইলেও আমাগোরে দেওন লাগবো।

'তোমরা রইছো বেহুদা বেইজ্জত লয়া।' গোগের ঘোষ মধ্যে থেকে বললে, তলা থিকা মানুষজন দেইখা আইছে কমলা ঘাটে মিলেটারীরা ঘাঁটি বহাইতাছেন।

আয়নল মাস্টার বললে, 'টাকা যোগানোর চিন্তা বাদ দিতে হবে, ও দিয়ে শেষ পর্যন্ত ওদের রোখা যাবে না। আর খাই ও তো নেহাত কম না, রক্তে রক্তে চুষে নেওয়া এই হচ্ছে মতলব। সেদিন চা নাশতার নাম করে নিলো পঞ্চাশটা টাকা। এক হপ্তা যেতে না যেতেই আবার বায়না, বুঝে দেখেন কি বিশ্রি আমাদের কাজটা, সবই তো দেশের জন্যে। একটু আধটু আমোদ ফুর্তি না পেলে মরে ভূত হয়ে যাবো, আমাদের ফিষ্টির জন্যে একটা ছাগল চাই, আপনি একটু বলে দিলেই হয়ে যায় নানা। কতো হাত কচলানি, চাপাও জানে এরা হ্যাঁ। সীবু ঘোষ নিজ থেকেই বললে, আমি দেবো, আপদেবিপদে অমন এক আধটু মন যুগিয়ে চলতে হয় দুষ্ট লোকজনের। খুব হল্লা পাকিয়ে তো ফিষ্টি করলে, তারপর আবার হাত চুলকানি,

www.nagorikpathagar.org

বাইরে থেকে আসা রাজাকাররা নাকি মানতে চায় না। আলী আহম্মদ বললে, আমি শুধু আপনার মুখ পানে চেয়ে, ওদের কোনোরকমে ঠেকিয়ে রেখেছি, আর বুঝি পারলাম না, আমি তো নামে কমাণ্ডার, বলতে পারেন ওরাই সব হাজাড়ী দেশের লোকজন। বোঝেন না, দুটো পয়সাপাতি আর আমোদ-ফুর্তির জন্যেই তো এ চাকরি নিয়েছে শালারা। বিলাইগতি নলিতা কি আর নকলা থানায় এক একজনের নামে দশ-বিশটা করে মার্ডার কেস ঝোলানো ছিল এতো দিন, এখন হাতমুখ ধুয়ে সব দেশের কাজে লেগেছে। কালিয়ানগর, স্টিমাজেহেরা, কবুতরমারী, এই সব গ্রামের বিখ্যাত বিখ্যাত রোস্তম এরা, তেমন বুকের পাটা কার আছে ওদের ঠেকাবে। গ্রামের লোক হয়ে আমার বেধেছে মুশকিল, ওরা কচু বিশ্বাস করে আমাকে, তলে তলে আমি নাকি নিছক মায়ার টানে দুশমনদের সামাল দিয়ে যাচ্ছি সমানে। বস্তা বস্তা কথা। তারপর তো নিলে এক হাজার টাকা। রাজাকাররা বলছে, সব জানা আছে আমাদের। দেশের দুশমন আর একটাও রাখবো না, বেছে বেছে মারবো, ধুলোয় লুটিয়ে দিব সব কিছু। এক হাজার টাকা দিয়ে ওদের নাকি অপমান করা হয়েছে। দাও মারা আর কি, ওরা এখন চাচ্ছে কোপ বসাতে, লুটে পুটে নিতে, খেয়ে খেয়ে নোলা দশ হাত বাড়লে যা হয়। আবদুল্লাপুরের রাজাকারেরা হিন্দুদের কাঠের গোলায় আগুন লাগিয়ে দিব্যি বিখ্যাত হয়ে গেছে। রাতারাতি বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে এখন দমাদম যাকে পছন্দ তাকে ঘরে তুলছে, যেচে সালাম দিচ্ছে মানুষজন, এক এক রাজাকারের বৌয়ের হাতে দু'চারটি করে ঘড়ি। তারা এখন ঘড়ি পরে খুন্তি নাড়ে, ঘড়ি পরে খালে নামে, ওয়াটার প্রুফ ঘড়ি। হাতে হাতে সব ট্রানজিসটার, পেশাব-পায়খানার জন্য বাশ বনে ঢুকলেও হাতে ঝুলিয়ে রাখে। রাহেলিল্লাহ কাণ্ড এই সব, এদের তো মাথা বিগড়ানোরই কথা।

এতোদিন যে ঠিক ছিল সেটাই তাজ্জবের। দাও তো মারবেই। এ হচ্ছে গিয়ে হাতির পিঠে চেপে ভিক্ষে করা– '

রঘুপাল বললে, 'আপনি ঠিকই ধরেছেন মাস্টার সাব। টাকা দিয়ে ওদের আর ভুলানো যাবে না। বেশির পক্ষে চেষ্টা চরিত্রির করলে হয়তো আরো দু'চারদিন হামলাটা কোনো মতে ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন, কিন্তু কি লাভ তাতে? কত পয়সা আমরা দিতে পারবো, দেশের কার না হাতটান অবস্থা এখন, নগদ টাকা কারো হাতেই নেই, ওদের ইচ্ছে এইভাবে চাপাচাপি করে দলে নেওয়া, তারপর নুনের ঋণ শোধ করা। নিজেদের ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হবে। এখন সামনে আর কোনো রাস্তা নেই, গ্রাম ছাড়তে হবে আমাদের। কি হবে গরু-ছাগল পেতল কাঁসা আর ভিটে মাটির মায়া করে, যেখানে ইজ্জত নিয়ে টানাটানি, জান নিয়ে টানাটানি।

বুড়ো হাজরা এতোক্ষণ হাঁটুমুড়ে পিছনের দিকে বসে ছিল। একটু সামনের দিকে এগিয়ে বসে খুনোখুনি দেখার মতো বড় বড় চোখে বললে, পাল মশায়, আপনে ক্যাবল গরু ছাগল, ঘটিবাটির কথাডাই কইলেন দেহি, সাতগায়ে আমাগোর খোলামকুচির লাহান টেকা ছড়ানো সব দাদনের টেকা–

www.nagorikpathagar.org

রঘুপাল বললে, 'ঘর-বাড়ি, জমি জিরেত সব ফেলে মানুষজন যাচ্ছে না?

তা তো যাইতাছেন, কিন্তু আমরা কি পারুম, আমার তো মাথায় আহে না–

'উপায় না থাকলে করবেনটা কি?'

বাপ কাকার ভিটিমাটি, কতো ঝড় জলই না গ্যাছে, মাটি কামড়াইয়া পইড়া থাকছি, এই বুড়ো কালে সব ফালাইয়া কই যামু, ক্যামনে যামু আমার মাথায় কিছুই আসে না পালমশায়, কিছুই বুঝতাছি না আপাতত :–

'এতো বড় ঝুঁকি নিয়ে গাঁয়ে থাকার কোনো মানে হয় না, গ্রাম ছেড়ে ধারে কাছে কোথাও উঠতে হবে আমাদের আপাতত। যোগেন ঘোষ কেঁদে ফেললে। এমন দুরবস্থায় পুরুষ মানুষের কান্না শোভা পায় না, চারপাশে কোলেপিঠের কাচ্চা বাচ্চা কি হয়, এত সব জেনেও যোগেন ঘোষের কান্না থামে না। 'যোগেনদা আপনের আউকাউ রাহেনদি। পেছন থেকে কেউ ধমক দিলো, কানদনের বহুত সময় পাইবেন, ক্ষ্যামা দ্যান অহনে– '

বুড়ো হাজরা বললে, 'যাইতে আপত্তি নাই, কিন্তু পামুডা কি, ভিটিমাটির কিছু কি থাকবো– '

'অহনেই আপনেরে ফিরনের চিন্তায় খাউজাইতাছে' রঘুপাল বললে, লুটপাটের নেশায় ওরা কবে নেবেই, মাস্টার সাব আপনি কি বলেন?'

ঠিক।

'কমলাঘাট পর্যন্ত যদি আর্মির ছাউনি পড়ে, তাহলে আর কোন ভরসায় এখানে পড়ে থাকা। আলী আহম্মদের লেজ তো গজাবেই।'

বুড়ো হাজরা আবার বাদ সাধলো। বললে, যাওন কইলেও তো আর যাওন যায় না পাল মশায়, কিছু গুছায়া না লইলে চলবোডা ক্যামনে?

রঘুপাল বললে, সে সময় কোথায়, ওরা যদি এই রাত্রেই হামলা করে বসে?

বৌ-ঝি পোলাপান লয়া এই রাত কালে নাও ঠেলন কি মুহের কথা। মুকন্দ সদগোপ তিন বার কেশে গলা সাফ করে বললে, 'রাইতে যাওন অসম্ভব।'

ঠিক এই সময় বুড়ো হাজরার নাতি সুখেন এলো হাঁপাতে হাঁপাতে।

এমন হাঁপাইতাছস ক্যান, হইছেডা কি?

দম নিয়ে সুখেন বললে, 'রাজাকাররা হাটে আগুন দিচ্ছে– '

হাটবার গেছে গত কাল। এমন দ্রুত সব ঘটবে, কেউ তা আঁচ করেনি। একমুহূর্তে সকলের মন থেকে সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঘুচে যায়। এখন আর কোনো সন্দেহ নেই কারো মনে, হামলা একটা আসবেই, যেমনই হোক তার চেহারা, ওদের ঠেকানো যাবে না, বিপদ এখন দোরগোড়ায়।

আয়নল মাস্টার জিজ্ঞেস করে, 'বুঝলে কি করে রাজাকাররাই আগুন দিয়েছে'

সুখেন বললে, ঘাটে একখানা লওপাড়ার নাও ভিড়ছিলো, মাঝি কইলো হে নিজ চক্ষুতে দেইখা আইছে রাজাকারগো, হেরা বাইছা বাইছা হিন্দু দোকানগুলাতে আগুন দেওয়াইতাছে– '

www.nagorikpathagar.org

'ইয়া রাব্বুল আলামিন। তবু ভালো, আমি তো ভেবেছিলাম ফাঁকফোঁক দিয়ে হয়তো আর্মিই এসে পৌছেছে।

যোগেন ঘোষের কান্না ভেতরে ভেতরে বেশ ভালো মতোই সংক্রমিত হয়ে গিয়েছিল, পাছে পাড়াসুদ্ধ মরা কান্না শুরু হয়, এই ভয়ে অনেকেই বেগ দমন করছিল।

বিশু ঘোষও এই দলের। হাঁটুর গায়ে চোখ নাক ডলে বিশু ঘোষ বললে, 'মাস্টার সাব, আপনে গিয়া ওগো কন, হ্যাগো যার মনে যা লয় নিয়া যাক। রঘুপাল বললে, 'আপনি থামুন।'

'ক্যান কথাডা কি আমি খারাপ কইছি? পাঁচ জনে কউক! আয়া ঘরের টিনগুলি খুইলা নিয়া যাউক, গরু-ছাগল, পেতল, কাঁসা সব লয়া যাউক– '

ফটাফট কয়েকটা গুলির শব্দ ভেসে আসে। দুটো হারিকেনের একটি দপদপ করছিলো এতোক্ষণ, মাঝে মাঝে গলগলে ধোঁয়া ওগরাচ্ছিলো; এখন সেটি নিভে যায়। আতঙ্কগ্রস্ত মানুষজন এর ওর মুখের দিকে তাকায়। যদিও গুলির শব্দের সঙ্গে হারিকেনের এই আচমকা নিভে যাওয়া সম্পূর্ণ সম্পর্কশূন্য তবু বিভীষিকা সৃষ্টি হয়, ফিসফাস গুঞ্জন চাপা আর্তনাদের মতো শোনা যায়। 'ফাঁকা আওয়াজ' রঘুপালের এই অভিমতে বিশেষজ্ঞের দৃঢ়তা থাকলেও, যেন কিছুটা রহস্যময় মনে হয় সকলের। গুলির শব্দটা আসছে সেই দিক থেকে, যেখানে আগুনের লকলকে শিখা এক একটা দোকান ঘরের চালে হল হল করে দাপিয়ে উঠছে, হাটখোলার অশথ গাছের নিচে ওরা গা গরম করছে।

'কইলো আমাদের গ্রামের দিকে আইবো হেরা' হঠাৎ সুখেন বললে, 'ওগো কাছে নিকি কইছে, ঘোষেগো কয়া দিচ, আমরা আইতাছি।

বুড়ো হাজরা বললে 'কাগো কাছে কইছে?'

'মাঝির কাছে কইছে।'

এক হাকড়ানি মারলো হাজরা। বললো, 'খুইলা কইতে তর কি অয় শালার জবনা। নওপাড়ার হাবিব মাঝির কাছে কইছে।'

রঘুপাল বললে, 'এটা একটা তামাশা, আমাদের ভয় দেখাতে চায়– '

আয়নল মাস্টর সায় দিয়ে বললেন, 'আমার ধারণাও তাই, একটু খেলাচ্ছে।

বিশু ঘোষের কাছে ব্যাপারটা এতো সহজ মনে হয় না : গ্রাম জুড়ে দাঙ্গা হাঙ্গামা, লুটতরাজ শুরু হয়ে গেছে, তার হাবভাবে সেই রকমের আতঙ্ক। বিশু ঘোষ বললে, 'আপনারা যাই কন না ক্যান, কিছুই ভালো ঠেকতেছে না, একটা কিছু করেন– '

ইতিমধ্যে মেয়েদের মধ্যে হাউমাউ শুরু হয়ে গিয়েছিল। এখন ঘরের উঠোনে দাঁড়িয়েই আগুনের আস্ফালন তারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। কান্নাকাটি ও সোরগোলে শিশুরা ভয় পায়।

বুড়ো একটা বাঁশ তুলে উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালো। 'পিটামু কইলাম, এক ধারছে পিটামু মাগিগো, এই. কান্দনের সখ চাপছে অহনে– ' কেউ একজন মুখ ঝামটা

www.nagorikpathagar.org

উঠলো। 'ক্যান, বোন্দা বুইড়াগুলির যহন মাগীগো রহম কান্দে, তখন কিছু করার পারো না– '

'ওগো ত্যাজ বেবাক মাগীগো কাচে– ' এ গলা যে তার পুত্রবধূ হাজরার সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। সে বললে, 'তগো লয়াই ব্যাক ঝামেলাডি। তরা না থাকতি তো দেহা যাইতো কারে কয় ফয়সালা। সবতে মিলা ঝাঁপায়া পড়তাম ওগো ঘাড়ে, ক্যান মনে নাই তগো, ডাকাত খেদাই নাই, ডাকাত গো ক্যাল্লা ফালা করি নাই? উঠানের এক কোণে অন্ধকারে একটা ওল্টানো ঝুড়ির ওপর এতোক্ষণ বসে ছিলো তপা। সে উঠে এলো। বুড়ো হাজরার হাতের বাঁশ কেড়ে নিল, তারপর ঝোঁপের গাদায় ছুঁড়ে দিয়ে ভেংচি কেটে বললে, 'দাদার কালে ঘি খাইছিলেন আপনে– '

'বেজাইতা।'

'ক্যান ওগো বাধা দেওন যায় না, আমাগো হাত পাও নাই?'

'পারবি ঠেকাইতে, পারবি মেলেটারিগ, ক, পারবি?' তর মায়েরে বাছাইতে পারবি অগো হাত থিকা, ক–

২.

গোলাগুলির শব্দ অনেক আগেই থেমে গিয়েছিল।

আকাশের এখানে ওখানে ধানের আটির মতো দু'একটা পোচ ধরানো সাদা মেঘ। শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ দূরের গ্রামগুলোর মাথায় থম ধরে আছে। সন্ধ্যার পর নতুন করে আবার গুমোট বেঁধেছিল, একটু একটু করে তার দানা ভাঙ্গছে, মৃদু মৃদু বাতাসে গাছের পাতায় শিরশির করে। বর্ষায় জলবন্দী গ্রামগুলো ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে এখন।

অক্ষম আক্রোশে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়ায় জড়িয়ে পড়েছিল তপা। ঘোষ পাড়ার সকলে মিলে আয়নল মাস্টারকে রাজী করিয়েছিলো তাদের সঙ্গে রাত কাটাতে; হোক চাই না হোক ভরসা বলে একটা কিছুর বুড়ি ছুঁয়ে থাকা দরকার। মনোবল বলতে কারোই কিছু ছিল না, ভেতরে ভেতরে সকলের সব বিশ্বাসই ঝাঝড়া হয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত এই সাব্যস্ত হয়েছিল, রাতটা পাড়াসুদ্ধ সবাই জোট পাকিয়ে কাটিয়ে দেবে কোনো মতে এবং সকাল হতেই যে যার সুবিধা মতো গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে, উঠবে দক্ষিণ চারিগাঁও এর দিকে। এমনই একটি দুঃসময়, কেউ কাউকে ভরসা দিতে পারে না, বিপদও আসতে পারে যে কোনো দিক থেকে।

তপার সমস্যা কিছুটা জটিল। তার কলেজের হিন্দু-মুসলমান সব সহপাঠির কথা তার মনে পড়ে। এছাড়াও আছে বাইরের বন্ধুবান্ধব, জানা শোনারা। এখন কোনো কিছুই আর হিসেবে মেলে না। এতদিন সবচেয়ে নিরাপদ ছিল গ্রাম। শহর ঝেঁটিয়ে গ্রামে ঝাঁক বেধেছিল আতঙ্কগ্রস্ত মানুষজন। এখন বিপদ দেখা দিয়েছে সেই গ্রামের একেবারে ভেতর থেকে। হোক না রাজাকার তারা তো বাঙালিই, দেশের মানুষ,

www.nagorikpathagar.org

তপা ভেবে পায় না এরা কেন এমনভাবে নিপীড়নের খেলায় মেতে উঠেছে সরাসরি। বাঙালি নিয়ে কথা, জাত আর ধর্মের কচকচি শিকেয় উঠেছিল; এ পাওয়াটা না চাইতেই, আর তপার চৌহদ্দিও অনেকটা বেড়ে গিয়েছিল এর ফলে।

রাজাকারগুলো বাঙালি, তপা জানে। ভাঙা স্বপ্ন আর জোড়া লাগানো যায় না। রাগে অক্ষমতায়, হীনমন্যতায়, সে ছটফট করতে থাকে। আগে এক রকম ছিল তবু; সেখানে স্বপ্ন টপ্পের কোনো বুড়বুড়ি ছিল না। মাঝে গায়ে আরো বাতাস লাগানোটাই হয়েছে কাল, তপার ইচ্ছে করে নিজের চুল ছিঁড়তে। তার আশঙ্কা এই রাত্রির মধ্যেই অঘটন যা ঘটার তা ঘটে যাবে। স্বেচ্ছাসেবকদের কত না বহর এসময়। এ বলে আমায় দ্যাখ, ও বলে আমায় দ্যাখ, এখন ছিরি ধোয়া তুলসিপাতাটি, নামগন্ধেই এখন কালো। সব কিছু ছিল একটা উৎসবের মতো, এখন উৎসব শেষ করে যে যার ঘরে ফিরে গেছে, পড়ে আছে খালি মণ্ডব, শশ্মানের মতো হাঁ শূন্যতা। নূনির সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার। এই মুহূর্তে নূনিকে চাই। মুকুন্দ সদগোপের সম্বন্ধীর মেয়ে নূনি, বাপ মা খোয়ানো, তারপর থাকলেও তা অন্য ভাবে, তখন কেউ আর কাউকে চিনবে না।

এখন কষ্ট, তপার মনে হতে থাকে এতো দিন সে কেবল নূনির জন্যেই বেঁচে ছিল। কিংবা এতোদিন সে মরেই ছিল। নতুন করে আবার বেঁচে উঠেছে শুধু একবার প্রাণ ভরে নূনিকে দেখতে চায়।

গোবর গাদার কাছে কামরাঙ্গার ঝোঁপে বাতাস ভিড় করে। এখন হু হু করে বাতাস বইছে; ঠাণ্ডা বাতাস, তাতে জলজ উদ্ভিদের ঘ্রাণ। এই ঘ্রাণে এক রহস্য-পুরীর ছবি তীর তীর করে, গা কাটা দেয় তপার; এখন সব কিছু তার কাছে অচেনা হয়ে গেছে, জোনাকির এই যে বিপুল স্রোত, এও সে কখনো দেখেনি। ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকিরা এমনভাবে ওঠানামা করতে থাকে যা দেখে মনে হয়, অদৃশ্য আবর্তে পড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে ওরাও।

বুড়ো হাজরার ঘরে, ঝাঁক বেঁধেছে একটা দল। এই দলে মুকুন্দও। ছোঁক ছোঁক করে ঘোরাঘুরি জুড়ে দেয় তপা, শেষ পর্যন্ত দেখাও পেয়ে যায়, তামাক সেজে মেসোর হাতে হুঁকো ধরিয়ে দিয়ে পা টিপে টিপে ফিরছিলো নূনি।

তপা নূনির হাত ধরে। তারপর উঠান পার হয়ে ছাড়া বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে হনহন করে। তার মুখে কোনো কথা নেই। এমনিতেই নূনি একটা হাবা কিসিমের, তার মাথায় তেমন কিছু খেলে না, সে শুধু ভয় পায়।

ছাড়া বাড়ির পরে একটা আদ্যিকালের কড়ুই গাছ। তারপর নিম নিসিন্দে। পরিত্যক্ত বসতবাড়ির ঢিবি। শক্ত করে নূনির হাত ধরে একে একে এইসব পার হয় তপা। তপা দা, কই যাও, ও তপা দা। উত্তর না পেয়ে নূনি আবার বলে 'হাতে যে লাগে– '

এখন তপার কোনো হুস নেই। জলজ উদ্ভিদের ঘ্রাণের মতো নিজের কাছে সেও এখন অচেনা। এখন তার ঘাড়ে ভূত চেপেছে। নিম নিসিন্দের জোছনা ধরা ছায়া

www.nagorikpathagar.org

ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো ছড়ানো, ছড়িয়েছে সে-ই। এ যে ঝিল্লিরব এতেও তার কারচুপি আছে। বেছে বেছে সে যোগেন ঘোষের পানের বরজে ঢোকে।

'আমার শরীলডা যানি কেমুন করতাছে, তপাদা আমার ডর করতাছে।'

নিজে বসে, হ্যাচকা টান মেরে নূনিকেও বসায় তপা। 'কিছু বুঝছস; হোনছ নাই কিছু?'

নূনি বিড় বিড় করে বলে, 'ওরা কয় ঘরে আগুন দিব– '

'দিবই তো।'

'তপাদা আমাগো কি অইবো?'

'মাইরা লাশ বানাইব, কি হইবো আবার।' নূনির কান্না পায়। সে বললে, 'এহানে অইলা ক্যান, ভয় ডর নাই তোমার, মাইনষে দেইখ্যা ফালাইলে, তহনে? কি কমু আমি, পিটাইবো না মেসো– '

'থো।'

'আইজ তুমি যেন কেমুন করতছ তপাদা, অ্যামুন করতাছ ক্যান? তোমার কি অইছে আইজ?'

'নড়বি না কয়া দিলাম, বয়া থাক এইহানে' ছুটে বেরিয়ে যায় তপা, 'যামু আর আমু– ' পটাপট বাঁশের চটি ভাঙ্গে কয়েকটা। কয়েকদিন আগে নতুন করে লতা নামানো হয়েছে বরজে। নূনি যেখানে বসে, সেখানে গোড়া আলগা হয়ে যাওয়ার কিছু কিছু চিকন মাটি ছড়ানো। সেই মাটি তুলে মুঠো বাঁধে নূনি। কোনো কাঁকর নেই। ভুসভুসে। নূনি বসে বসে ভাবে তপা বড় জোরে হাত ধরেছে আজ, মনে হয়েছিল মুচড়ে দিবে, কিছু একটা হয়েছে, তাকে শাস্তি দিতে চায়।

মুঠো থেকে বুলানির মাটি ফেলে দেয় নূনি। তার কান্না পায়। চারদিকে এই যে কতরকমের সব ভয়, তার ওপরে আবার নটঘট শুরু করছে তপা। বাঁশের চটির গা থেকে ফাঁস খুলে একটা উলুর ফিতা খুলে নেয় নূনি। দাঁতে কাটতে থাকে, তপাদা বড় নিষ্ঠুর। সে ফুঁপিয়ে ওঠে, একেবারে মায়াদয়া নাই।

কাঁধে দুটো ছালা আর একটিন কেরোসিন নিয়ে ফিরে এলো তপা অল্পক্ষণের মধ্যেই, এইমাত্র যেন বুনো জন্তুর দাবড়ানি খেয়ে এসেছে। ক্ষ্যাপাটে চাহনি, কেমন যেন অচেনা, ভয়ংকর ও দূরের মনে হয় নূনির।

সে একটা হাত ধরে তপার। তপাদা, তুমি করবা কি, তুমি পাগল হইছ?

'মরুম, তরে লয়া মরুম– ' ঘড়ঘড়ে গলায় তপা বললে, 'পারবি না?'

নূনি বললে, 'না ওসব পারুম না, কিসব কও তুমি, ঠিক নাই তোমার মাথা, কেমুন যেন করতাছ তুমি,

'জানস না কি অইবো? জানস কিছু? হাপ ধরে যায় তপার, সে প্রায় নিঃশেষিত। বললে, 'ছাড়ব নিকি তগো? ঘরে আগুন দিব।

নূনি হাউ মাউ করে ওঠে। 'ক্যান তুমি আমারে ডর দেহাইতাছ, পাইছ কি?'

www.nagorikpathagar.org

'হ আমি, আমি তোরে ডর দেহাইতাছি। হেরা আয়া লউক। দেহিচ অরা আয়া লউক। তগো ক্যামনে ফালা ফালা কইরা ফালায় দেহিচ।'

নূনি ভয়ে শিউরে ওঠে। দূরে কোথাও শিয়াল ডাকে। নূনি কেঁদে বললে, 'আমাগো কি হইবো তপাদা?'

কেঁদে ফেললো তপাও। দু'হাটুর ওপর মাথা রেখে হাউমাউ করে সে কাঁদতে থাকে। সে বললে, 'কতো সাধ আছিলো তরে বিয়া কইরা শহরে রাখুম, তরে দিয়া ক্যাবল গোবর ঘাঁটাইয়া লইলো, এ্যাগো মুখে তার দিয়া ঝাড়ু মারুম, ভাগ্যে নাই, কিছু হইলো না।'

একটা ক্ষীণ হৈচৈ ভেসে আসে বাতাসে। একবার মনে হয় দক্ষিণ চারিগাঁও থেকে, একবার মনে হয় ভবানীপুর থেকে। শেষে মনে হয় কোথাও নয়, এই বাগুইসারেরই একটা দিক থেকে শব্দটা।

'একলগে খেলছি কতো। মার খাচ নাই? ফালদা আহচ নাই দিনে রাইতে? পারছিলো বাইন্দা ধুইতে তরে? পারছিল?'

তপার হাঁটুর ওপর মাথা রাখে নূনি। বলে, না পারে নাই, কখনো পারে নাই, তপাদা, তুমি আমার নয়নের মণি আছিলা– '

'অহনে ক, কি অইবো আমাগো, ক্যামনে বাচুম আমরা, মাথা খারাপ হয়া যাইতাছে আমার– '

মৃগী রোগীর মতো ফোঁস ফোঁস করে গোঙাতে থাকে তপা। 'আমার কতো ইচ্ছা করছে, তবে কই নাই, তুই তর তপাদারে ছোট লোক কতিস। কমু ক্যান? তুই তো আমারই আছিলি, অহনেও আছস, কমু ক্যান, একদিন তো তরে পাইতামই।'

'আমার বুক ফাইটা যায় নূনি, তরে কইতে, নূনিরে– '

'তেমন হইলে আমি তোমার লগে মরুম। একলগে মরুম– ' নূনি তপার একটা কোল দেবে, স্তন দেবে, নূনী বললে, 'গলা জড়াজড়ি কইরা মরুম।'

'তুই ক, কখনো গায়ে হাত ছোয়াইছি তর, টিপাউপা দেখছি?

নূনি বললে, 'তপাদা তুমি তো আমার সোনার মানিক আছিলা।'

'ইচ্ছা করে নাই। কি কমু, কত ইচ্ছা না করছে, তরে বুকে লইতে ইচ্ছা হইছে, চুমা দিতে চাইছি, পারি নাই, তরে রাগামু ক্যান। তরে কাঁদামু ক্যান? রাইতে ঘুমাইতে পারি না। ক্যাবল তরে দেহি। আরো দ্যাহনের লাইগা পাগল হয়া যাই। কিছু তো তর অহনতরি দেহি নাই; তবু সবটি আমার মুখস্থ হয়া রইছে, ক্যামনে য্যান সব হয়া রইছে।'

'তোমার সাধ হয়, তোমার সাধ হয় তপাদা?' নূনী প্রায় ঘুমের অতল থেকে অর্ধস্ফুট সুরে বলে, কও নাই ক্যান আমারে, স্বামী, ক্যান কও নাই? আর কে দেখবো? আর কারে দিমু?'

তপার হাত কোল থেকে বুকের ভেতরে টেনে নেয় নূনি। কুঁকড়ে গিয়ে তপা বলে, 'নূনি আর কোনো সাধ নাই। মরনের আগে কেমুন য্যান খালি হয়া হয়া

www.nagorikpathagar.org

যাইতাছে সব। আমরা তা সাধ করছিলাম জীবন ভর রাজা রানী হয়া থাকুম– সে আবার হাউমাউ করে কান্না জুড়ে দেয়। নূনিও কাঁদে। খুব ভালো লাগে তার কাঁদতে। এরই মধ্যে জীবন যেন ছত্রখান হয়ে গেছে, অথচ আশ্চর্যের কথা তাতে নিজেদের কোনো হাত নেই; যেমন যোগেন কাকার এই পানের বরজ, সে তো জানেই ক্যাইলার মড়কে এটা সাফ হয়ে যাবে, তার গায়ে খুসখুসে জ্বর। এখনো সে অসুচী, এখন মানামুনি কি।

'তপাদা, তুমি তো আমার রাজাই আছিলা– ' কান্নার দমকে মোচর খেতে থাকে নূনি। এই সময় কুকুর ডাকে। সমস্ত নিস্তব্ধতার ভেতরে খুবই অস্বাভাবিক মনে হতে থাকে এই ঘেউ ঘেউ শব্দ। ক্রমশ এগিয়ে আসছে। তপা কান খাড়া করে, নূনি জড়িয়ে ধরে তপার গলা, বলে, তপাদা, ভালো ঠেকতাছে না আমার।'

তপা বললে, 'চুপ।'

বোঝা গেল এক আধটা নয়, একপাল কুকুর পাল বেঁধে ঘেউ ঘেউ জুড়ে দিয়েছে, ধীরে ধীরে এদিকেই এগোচ্ছে তারা।

সারা পাড়ায় চাপা কলরব ওঠে। তপা পটপট বাঁশের চটি উপড়ে বরজের গায়ে চোখ লাগিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। সামনেই সুখেনদের উঠোন, উঠানের এক কোণে গরুর গোয়াল, গোয়ালের পাশে করমচার ঝোঁপ, সব কিছু পরিষ্কার দেখতে পায় তপা; জোছনার কোটাল বান ডেকেছে আজ বাগুইসারে, কুটোগাছটিও চোখে পড়ে।

এক এক করে সব কটি কুকুর জড়ো হয় উঠোনে। মেয়েদের কান্না শুনতে পায় তপা। সমানে চিৎকার করে চলেছে কুকুরগুলো। একটা মড়মড়ে শব্দ কানে আসে। ঝোঁপ ঝাড় ভেঙ্গে কিছু একটা ছুটে আসছে, তপার গা কাঁটা দেয়। সে বাঁ বাঁ চিৎকার শুনতে পায়।

বন বাদার ভেঙ্গে উঠোনের মাঝখানে এসে দাঁড়ায় একটি গরু, গায়ে ছালের নাম গন্ধ নাই, রক্তাপ্লুত। বাঁ বাঁ করে বিকট নিশাদ তুলে তারপর একসময় গোয়াল ঘরের মুখে হুড়মুড়িয়ে পড়ে যায় ভয়াল দর্শন গরুটি। বরজের গায়ে চোখ লাগিয়ে সব কিছু পরিষ্কার দেখতে পায় তপা। সে আকাশের দিকে তাকায়। এই সময় চাঁদকে তার উচ্ছৃঙ্খল রাজাকার মনে হয়; জোছনা তো নয় যেন বিদ্রূপের হাসি, তাচ্ছিল্যের হাসি, বিকট রসিকতা।

www.nagorikpathagar.org

চাঁদের হিমে ঝড়বৃষ্টি

শেষ পর্যন্ত যা অনিবার্য তাই হলো। চূড়ান্ত পরিণতির হাতছানিতে প্রায় দিশেহারা অবস্থা হয়ে গেল বিস্তার। আমাদের দু'জনের ধামাচাপা সম্পর্কে নতুন বিচার করে দেখা প্রয়োজন। উদ্দেশ্যহীন গা ভাসাতে আমি আর বিন্দুমাত্র রাজি নই। এভাবে কোনোকিছুই চলতে পারে না। কোনো রকমের সম্পর্ক তো নয়ই। সব সম্পর্কের ব্যাপারটাই জটিল। জটিলতার জট ছাড়ানো তো আছেই, তারপরও থেকে যায় আয়নার মতো স্বচ্ছ ধারণার সামনে দাঁড়ানো, নিজেকে হুবহু দেখতে হাওয়ায় গা ভাসিয়ে আধবোঁজা ঘুমের ঘোরে এতোদিন কেটেছে আমার। না ছিলো কোনো প্রয়োজন, না কোনো তাড়না। মহৎ কি অসাধু কোনো উদ্দেশ্যর কথাই ভাবতে পারিনি এ যাবৎ। একে তো আমার স্বভাবটাই এই ধরনের তার উপর ছিল লুৎফুন্নেসার বরফের মতো ঠাণ্ডা চরিত্র।

স্ত্রীলোকের মেজাজ বা চরিত্র সম্পর্কে বলগাহীন ঢালাও মন্তব্য করা আমার পক্ষে রীতিমতো অপরাধ। লুৎফুন্নেসা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মেয়ের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য আমার কখনো হয়নি। লুৎফুন্নেসার ভাবলেশহীন অবিচল স্থির চরিত্র সত্যি কথা বলতে কি নিদারুণ প্রভাবিত করেছিলো আমাকে। এমনিতেই আমি সেই জাতীয় একজন পুরুষ জীবনভর যারা কারো না কারো প্রভাবের আওতাধীন ছাড়া নিজেকে ভাবতেই পারে না। লুৎফুন্নেসা সংসর্গের কথা যদি তুলি তাহলে একথা আরো বেশি করে প্রযোজ্য বিয়ে হয়েছিলো লুৎফুন্নেসার। স্বামী সন্তান সংসার সবই ছিলো এক সময়। লুৎফুন্নেসাকে চিরতরে পরিত্যাগ করেছে, ঘটনাটা এই রকম।

ছেলেমেয়েরা বিদেশে তাদের বাপের কাছে থাকে।

লুৎফুন্নেসা একা। একই স্কুলে আমরা শিক্ষকতা করি। সেখানেও ও সিনিয়র। ভিন্নতর একটা মর্যাদাও আছে ওর সেখানে।

কিভাবে অত্যন্ত অল্পকালের মধ্যে আমি প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলাম এখন আর সেকথা তেমন চিন্তা করে বলা যাবে না। মোটের উপর আমি নিজেই অনুরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। ওর চালচলন, আচার-ব্যবহার সব সময়ই সকলের চেয়ে আলাদা মুগ্ধ

www.nagorikpathagar.org

হবার মতো। ভীষণ একরোখা দৃঢ়চেতা মনে হতো ওকে আমার। ওর বলিষ্ঠ স্বভাব, স্বাতন্ত্র্যবোধ, নীরবতা, মারাত্মক সৌন্দর্য হয়ে উঠেছিলো আমার চোখে।

লুৎফুন্নেসা প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশি পিছিয়ে গিয়ে আমাকে প্রশ্রয় দেয়া শুরু করেছিলো। এর আগে আমার নিজের নিদারুণ মানসিক দুরবস্থার কথা আর নাইবা বললাম। অবজ্ঞা বড়ো ঘৃণ্য ব্যাপার। তার সামনে মানুষ বড়ো ছোট হয়ে যায়, হীন হয়ে যায়। লাফিয়ে দশ কদম এগিয়ে যাওয়ার কোনো রকম অভিপ্রায় আমার কখনোই ছিল না। শুধু পাশাপাশি চলতে চেয়েছি এর বেশি আর কি!

ওর সংযমের বিপুলতা স্কুল স্টাফদের মাঝে যতোই প্রশংসা অর্জন করুক না কেন, একথাও অক্ষরে অক্ষরে সত্যি– ওর ওই সাদা ধবধবে দাগহীন সংযমই অগোচরে প্ররোচিত করেছিলো আমাকে, লুৎফুন্নেসা হয়তো একথা জানে না।

এ সবই পুরনো কাসুন্দি। এরপর কতো কিছুই তো ঘটে গিয়েছে। এখন আমরা পরস্পরকে চিনি। অলিখিত এক নিয়মে ভিতরে ভিতরে এক ধরনের বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছে উভয়ের। সামান্য নরোম চাহনির ভিতর কী গভীর কথা যে লুকিয়ে থাকে দুজনেই তা বুঝতে পারি এখন। চোখে চোখে কথা হয় এভাবে। আমাদের ভিতরের যাবতীয় কোলাহল নিবিড় সন্ধ্যার মতো থির।

কিন্তু এই অর্থহীন বিস্বাদ হয়ে যায়। যাবতীয় চিত্ত-চাঞ্চল্যকে পুরু চাদরে ঢেকে রাখলে কি হবে, মাঝে মাঝে সব সংযম যেন ধুলোয় লুটোপুটি খায়। ইচ্ছে হয় দেয়ালে মাথা ঠুকি। চক্ষুলজ্জা ও সনাতন বস্তাপচা বেড়াজালকে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে বার বার। আমি কি কেবল ভিতরের কষ্টকে চাবকাবার জন্যেই জন্মেছি। ভালোবাসা এবং তার পাত্র নির্দ্বিধায় দুটুকরো করে ফেলেছে আমাকে, কী আশ্চর্য! কোনো সিদ্ধান্তেই পৌঁছুতে পারলাম না আজ পর্যন্ত। কে দায়ী এর জন্যে। এমন তো নয়, আমরা সিদ্ধান্তে হাসপাতালের বারান্দার প্রেমিক। যেন গাছের সঙ্গে মানুষের এক অদ্ভুত বোবা সম্পর্কের জের টেনে চলেছি দিনের পর দিন।

পিঠোপিঠি কয়েকটি দিন দাবানলের মতো আমর ভিতরে ক্ষোভ জ্বলছে। আহার নিদ্রা শিকেয় চড়েছে। পরিষ্কার সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে চাই এখন। সত্যের মুখোমুখি হতে চাই, মোকাবেলা করতে চাই। যদি কদর্য হয়, তাও অসম্ভব এইভাবে চলা।

একটানা বৃষ্টি চলছে কয়েকদিন। কাঁচা বাড়িঘর ধসে পড়ছে সব। নিম্নাঞ্চল আগেই প্লাবিত হয়ে গিয়েছে। মেঘলা আকাশ, বৃষ্টির পানি চোয়ানো চিতিপড়া দেয়াল, ঘরের ভিতরের ঘুপসী গন্ধ ক্ষুধার্ত এবং অবসন্ন কাকের অসহায় কাতরানি, সবকিছু একজোট হয়ে মর্মঘাতী মারাত্মক প্ররোচনায় সমানে দংশন করে যাচ্ছে আমাকে। এমনিতেই গুমোট আবহাওয়া কিংবা বৃষ্টি-বাদলায় খুব ছোটোবেলা থেকেই ভীষণ কাতর হয়ে পড়ি আমি। কী যে হয় ভিতরে ভিতরে এমন অসহায় এমন নিরুপায় যে মনে হতে থাকে। দুর্যোগের কলগ্রাসে তিল তিল করে ক্ষয়ে

www.nagorikpathagar.org

যাচ্ছি, নিদারুণভাবে মনে হতে থাকে এইসব। না আছে কোনো আশ্রয়, না কোনো অবলম্বন: দুরারোগ্য ব্যাধির মতো এইসব পরস্পরবিরোধী দাঁতাল চিন্তা বৃষ্টিধারার কলরোলে আরো হিংস্র হয়ে ওঠে।

তা প্রায় দিন পনেরো তো হবেই, লুৎফুন্নেসার সঙ্গে আমার দেখা নেই। ছুটিতে আছে। পনেরো দিন তো নয়, একটা বরফ যুগ। অদর্শনের যন্ত্রণা ভাবনা চিন্তায় প্রদীপের লিকলিকে শিখার মতো তির তিরিয়ে জ্বলছে। ঘরের ভেতরে ফ্যাকাশে স্তব্ধতায় গায়ে পুঞ্জ মেঘের মতো দীর্ঘনিঃশ্বাস জমে উঠেছে। বুঝতে পারি কি প্রচণ্ড আমার অনুরাগ। মারাত্মক মদিরার মতো এই অনুরাগ গভীর পাতালের দিকে অহরহ গলা ধাক্কা দিচ্ছে আমাকে; হাত পা আমার বাঁধা যে কোনো একটা পরিণতির জন্যে হন্যে হয়ে পড়েছি জন্তুর মতো।

মনে হয় অশ্বারোহী তাতারের মতো দুর্বার বেগে বয়ে চলেছে সময়। তার এক পাশে শালিকের ঠোঁট থেকে খসা খড়কুটোর মতো আমি পড়ে আছি।

পৌরুষ কাকে বলে? তা কি অর্জন করা সম্ভব? কি জানি! এই যে আজন্মকাল ছিটেফোটা আত্মবিশ্বাসও আমার নেই, এটা কেন! আত্মমর্যাদার কোনো বালাই নেই যাদের এই সব তো তাদেরই ব্যাপার। আমি যাচাই করে দেখতে চাই নিজেকে। সরাসরি ওর মুখ থেকেই সব শুনতে চাই। মীমাংসা চাই সবকিছুর। আমি জোর গলায় চলতে চাই– আমাদের এতোদিনের গোপন সম্পর্ক এখন তার সব মাহাত্ম্য হারিয়ে বসেছে; যেন বজবজ নোংরা কাদা, কাদার দাগ ধুয়ে ফেলতে চাই। কি অদ্ভুত রোমাঞ্চকর অনুভূতি। আমার আজন্মকালের ক্ষীণ পাতলা শরীর চাঞ্চল্যে রিন রিন করতে থাকে। প্রখর আলোরশ্মির মতো সাহসে জ্বলে উঠি হঠাৎ। এই সাহস এক অলৌকিক ইন্দ্রজালের নিরাময়ে সবল স্বাস্থ্যবান করে তোলে আমাকে। মূর্তিমান তেজী ষাঁড়ের মতো কটাকট সব বাঁধন ছিঁড়ে একছুটে নিজের আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে চাই রুদ্ধশ্বাসে। এখন পৃথিবীতে আমার একটাই কাজ। পরখ করে দেখতে চাই নিজেকে। যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পেতে চাই।

বৃষ্টির ছোবল থেকে কোনোরকমে গা বাঁচিয়ে লুৎফুন্নেসার ওখানে যখন পৌঁছুলাম তখন বিকেল। এখনো যে দিন আছে ঘড়ির কাঁটা ছাড়া ভিন্ন কোনো উপায় নেই তা ধরবার। ভিজে সপসপে অন্ধকারে জগৎ সংসার অবলুপ্ত হয়ে আছে। কর্মহীন নিশ্চল এক জগদ্দল পৃথিবীর মহাপ্লাবনের খলবলে তোড়ে নারকেলের মতো ভেসে চলেছে। শুয়ে ছিল লুৎফুন্নেসা। মনে হলো অসুস্থ। ক্লান্তির ছাপ চোখে-মুখে। তার মুখ যে এমন বিষণ্ন এমন করুণ হতে পারে এর আগে কখনো তা আমার ঘুণাক্ষরেও মনে হয়নি।

দলা পাকানো একটা চাদর গায়ের উপর ভালো করে টেনে কতকটা নিস্পৃহ কণ্ঠে লুৎফুন্নেসা বললে, তোয়ালে দিয়ে মাথাটা মুছে নাও। ইচ্ছে করেই মাথা মোছার ব্যাপারটা অগ্রাহ্য করলাম। ঝপ করে বসে পড়লাম বিছানায়। ঠিক ওর পায়ের কাছে।

www.nagorikpathagar.org

অনেকক্ষণ নিষ্পলক-স্থির দৃষ্টিতে আমার চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে রইলো লুৎফুন্নেসা। অস্থিরতা তোলপাড় করছিলো আমার ভিতর। যেন কোনো প্রতিক্রিয়াই হয়নি ওর। আগে থেকেই আমার সবকিছুই যেন ওর নখদর্পণে।

কি অসহ্য। মোমের আলোর মতো ওর থির দৃষ্টি সামনে আমার সব বজ্র আটুনির গেরোগুলো একে একে শিথিল হতে শুরু করেছে। আমার ভিতরের চাদর মোড়ানো মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষটি আর একটু পরেই বোকার মতো হাসতে শুরু করবে, বুঝতে পারি। ওখানে বসলে কেন? কোনো উত্তাপ নেই ওর গলায়। বিশ্রী রকম ঠাণ্ডা। যেন আর একটু পরেই ও মরে যাবে।

বললাম, 'তুমি কি অসুস্থ?'

'হ্যাঁ।'

'খবর দাওনি কেন?'

'নতুন কিছু নয় এটা– '

'আমি কি তোমার কেউ নই?' হঠাৎ প্রগলভ হয়ে উঠলাম। এমন বিশ্রী নাটুকেপনার কথা সুস্থ মস্তিষ্কে ভাবতে গেলে আমার নিজেরও খুব জঘন্য মনে হবে।

'কি হয়েছে কি তোমার?' ঠোঁটের পাতা ছাল কামড়ে লুৎফুন্নেসা তীর্যকভাবে তাকালো, 'এসে থেকে অমন হাসফাস করছো কেন, যেন পানিতে ডুবে গেছ।'

আচমকা ওর পায়ের পাতার মধ্যে মুখ গুঁজে দিলাম নির্বোধ শিশুর মতো। দয়া স্নেহ প্রেম কতো কিছু চাই আমার। ভারবাহী জন্তুর মতো অর্থহীন এ মর্মান্তিক জীবন আর কতো টানবো। মনে হলো উত্তেজনার এই শ্বাসরুদ্ধকর ধকল সহ্য করতে না পেরে যে কোনো মুহূর্তে আমার ভিতরে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে যাবে। যে কোনো মুহূর্তে একটা নির্বোধ অপদার্থ অসহায়ের মতো হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলবো।

অনেকক্ষণ এইভাবে কাটলো। যেন মরে গিয়েছে লুৎফুন্নেসা। বাতাসের গায়ে ভর করা বিলাপের মতো আমি ওর ফিসফিসানি শুনতে পেলাম। বললে, 'আমার জন্যে কতো কষ্টোটাই না পাও তুমি? সবই বুঝতে পারি। কিন্তু কি করবো– '

ওর পায়ের পাতায় পাগলের মতো চুমু খেতে শুরু করি আমি। এই নরোম ধব্‌ধবে রোগা পা-জোড়া আমার কতো আদরের। একজোড়া সুখী মাছ! এদের কোনো পাপ নেই! ইচ্ছে করে বুকের ভিতর লুকিয়ে রাখি।

হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো লুৎফুন্নেসা। বললে, 'আমাকে এমন কষ্ট দিয়ে খুব আনন্দ পাচ্ছো, না? ঠিক আছে। যা খুশি তাই করো, আমি কিছু বলবো না। আমি তো ফ্যাল্‌না– '

মনে হলো একজন গা গোটানো নিঃসম্বল মহিলার যাবতীয় অসহায়তাকে বাগে পেয়ে কাদাছাদা শুরু করেছি। ভিতরে ভিতরে আমি তুখোড় ইতর। বড়ো ছোট হয়ে

www.nagorikpathagar.org

গেলাম। ভার ভার গলায় বলতে থাকি, 'ভালোবাসি, বিশ্বাস করো ভালোবাসি! তোমাকে না পেলে আমি মরে যাবো। আমার আর কেউ নাই। আমি আর কিছু জানি না। দয়া করো লুৎফা, দয়া করো। আমাকে দূরে ফেলে দিও না। বিশ্বাস করো, আমি অন্য কারও নই বিশ্বাস করো– '

লুৎফুন্নেসার কান্না আর কিছুতেই থামতে চায় না। আমার দিকে না তাকিয়েই ও বললে 'আমি যে কি করবো– '

রানী, আমার মুখে একটা লাথি মারো। রানী, আমার মুখে একটা লাথি মেরে দেখো! তারপরও আমি তোমার জন্যে হাসবো। রানী, আমার মুখে একটা দাগ মারো–

তুমি একটা বর্বর, মেয়েলোক

রানী আমার মুখে একটা লাথি মারো–

'কী এমন অপরাধ করেছি তোমার কাছে? কেন এমন শাস্তি দিচ্ছো আমাকে? কাঁদিয়ে খুব আনন্দ পাচ্ছো না?'

পা-জোড়া হয়ে যায়। চুমু খেতে থাকি আমি। ধব্‌ধবে ফর্শা চামড়ার নিচে নীল শিরাগুলো ছিলবিল করতে থাকে, ধীরে ধীরে ছড়াতে থাকে। নেশা ধরে যায়।

কী যে করো কাছে এসে বসো। মকবুল লক্ষ্মী সোনা আমার কাছে এসে বসো।

দিশেহারার মতো তখনকার তখনই আমি ওর পাশে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ি। দু'হাতে জাপটে ধরি ওকে। প্রবল আবেগে প্রায় মরণোল্লাসে হামলে পড়ে চুমুর পর চুমুতে অস্থির করে তুলি ওকে। লুৎ লুৎ লুৎ তুমুল উত্তেজনায় এক একবার সজোরে জাপটে ধরে ঝাঁকুনি দিতে থাকি। 'আমি কোনো শাসন মানি না। আমি তোমাকে চাই। তুমি আমার। আমি তোমাকে পর্বতের চূড়া থেকে ধসিয়ে নিয়ে আসবো।'

আমার বুকের ভিতর এতোটুকু একটা পাখি হয়ে যায় লুৎফুন্নেসা। দু'চোখ বন্ধ করে মৃতপ্রায় পড়ে থাকে। কাল্পনিক শত্রুর মুখোমুখি বিজয়োল্লাসে ফেটে পড়তে থাকি মুহুর্মুহু। গায়ের সব শক্তি ঢেলে মাতালের মতো ঝাঁকুনির পর ঝাঁকুনি দিয়ে অনর্গল বলতে থাকি আমি লুৎ লুৎ লুৎ তোমার সবকিছু একা আমার। বলো হ্যাঁ। বলো! বলো, বলো, বলো, বলো! একবার দুবার তিনশো বার লুট করবো তোমাকে। ছিঁড়ে ফেড়ে ছত্রখান করে দেবো তোমাকে। নীল চিঠির মতো কুটি কুটি করে ছিঁড়ে এক ফুয়ে উড়িয়ে দেবো বিশ্বময় লুৎ লুৎ লুৎ–

এক হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে অর্ধচৈতন্যের মতো বিজড়িত কণ্ঠে লুৎফুন্নেসা বললে, 'ওরে পাগল আমার বুঝি কষ্ট হয় না। মরে যাবো যে!

ওর ঠোঁটে একটা কামড় বসিয়ে একটানে পটাপট ছিঁড়ে ফেললাম ব্লাউজের বোতাম।

লুৎফুন্নেসা বাধা দিলো। একটা থাবা মারলাম। স্তনের উপর হাত রেখে নির্মমভাবে একটা চাপ দিলাম।

ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়ে অবসাদগ্রস্তের মতো ও বললে, আমাকে ব্যথা দিয়ে খুব আনন্দ পাচ্ছো বুঝি?

www.nagorikpathagar.org

পাচ্ছিই তো!

একটা আস্তো গাড়োয়ান–

একশো বার গাড়োয়ান।

চোখ খুলে ও হাসলো। এমন ম্লান ওর হাসি। বললে, 'এভাবে কেউ আদর করে?'

'কি, করবেটা কি, মারবে?

মেয়ে মানুষের শরীর খুব নরোম। অত্যাচার করলে কি ইবা তার থাকে–

আমি ওকে সবসুদ্ধ কোলের উপর তুলে নিলাম চুমু খেলাম চোখের পাতায়। কপালে ঠোঁট চেপে ধরে বিড় বিড় করে যা মনে এলো তাই বললাম। এলো খোপা আগেই ভেঙ্গে গিয়েছিলো, চুলের গন্ধের থেকে ভারী হয়ে এলো আমার বুকের ভিতর। অনেকক্ষণ ধরে আলতোভাবে ওকে আদর করলাম। আদরে আদরে বিছানার একটা ধার কখন যে বিশ্রীভাবে এলোমেলো হয়ে গেছে খেয়ালই করিনি তা। কানের কাছে তুলে এক সময় বললে, 'তোমার ভালো লাগছে?'

বললাম, তোমার?

দু'চোখ বন্ধ করে কোমল তন্দ্রার ভেতর থেকে অবোধ শিশুর মতো ও বললে, 'খুব ভালো লাগছে– '

চোখে ঠোঁট চেপে আমি আকুলভাবে বললাম, 'রাগ করোনি তো?

কেন?

এই যে এতসব অত্যাচার–

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লো লুৎফুন্নেসা। এতোক্ষণ আনন্দ চলকে উঠেছিলো ওর মুখে। আবার বিষণ্নতা ধরলো তাতে। বুকের ভিতর মুখ লুকিয়ে কতকটা আত্মগতভাবে বললে, সব সময় তোমাকে নিয়ে এরকমরই একটা ভয় ছিলো আমার। কেন জানি না তোমাকে দেখার পর থেকেই এই রকম মনে হতো। হতো একদিন না একদিন আমার সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দেবে তুমি। আমার এমন কোনো শক্তি নেই যে তোমাকে ঠেকাবো।

তার মানে মানুষের ভিতরের দুর্দান্ত দস্যুকে দেখতে পাও?

তা জানি না। তবে তোমার ভেতরটা আমি ঠিকই দেখতে পেয়েছিলাম। ওপর থেকে দেখে অন্যরকম মনে হয় ভিতরে ভিতরে যে সব সময় তুমি একজন শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে চলেছো তা বুঝতে পারতাম।

ওর বুকে নাক চুবিয়ে আমি মরা ঘাসের ঘ্রাণ পেলাম। এই ঘ্রাণ আমার অত্যন্ত প্রিয়। বললাম, তোমার বুক কুমারী মেয়েদের মতো।

কী যে সুন্দর।

'অনেক দেখেছো বুঝি?'

'দেখিনি, তবে আন্দাজ করতে পারি– '

আচ্ছা বুক দেখে তোমাদের কি হয়?

জানো না বুঝি?

www.nagorikpathagar.org

আমার মাথার চুলে আদর করে বিলি কেটে লুৎফুন্নেসা বললে, 'লক্ষ্মীটি বলো না, আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে–

আগে দেখতে দাও, তারপর বলবো।

বুকের উপর একটা হাত শক্তভাবে রেখে ও বললে, 'না' আমি শক্তি প্রয়োগ করতেই বললে, 'রাক্ষস।'

গা থেকে ব্লাউজ খোলার আগেই পাশ থেকে চাদর টেনে নিলো লুৎফুন্নেসা। কোনো ওজর আপত্তিই সে শুনবে না। প্রায় মরিয়া হয়ে ও বললে কি যাচ্ছে তাই করছো, আমাকে কি পেয়েছো বলো তো? চাদর সরালে ভালো হবে না কিন্তু–

আদরে আদরে ওকে অস্থির করে তুলবার সুযোগে চাদরের তলায় আমি ওর বুক আলগা করে ফেললাম এক সময়; আমার আঙ্গুলের কৌটোয় থরথরিয়ে মৃদু মৃদু কাঁপছে ওর কিশোরীর মতো একটা স্তন। সর্বাঙ্গ শিউরে উঠতে থাকে আমার। কোনোরকমের বাধা আসার আগেই আচমকা চাদরের নিচে গলে গিয়ে একটা স্তন মুখে নিয়ে বিপুল আনন্দে বিচূর্ণিত হতে থাকি আমি। উত্তেজনার তুমুল আলোড়নে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে গো গো করে গজরাতে থাকি। ধমনীতে এবং প্রতিটি লোমকূপে নিঃশ্বাসে এবং প্রতিটি স্পর্শে এক সর্বকালব্যাপী মর্মরধ্বনি নিদারুণ ঐক্যতান ঝংকৃত হতে থাকে, কানে তালা লেগে যায় আমার।

শেষে এক সময় ক্ষীণকণ্ঠে অর্ধস্ফুট আর্তনাদে কঁকে উঠলো লুৎফুন্নেসা। দু'হাতে আমার মুখটাকে টেনে আনলো তার ঠোঁটের ওপর। চুমু খেলো। গলে যাওয়া চাঁদের মতো মুখ ও যন্ত্রণার অবিমিশ্র শিহরণের ভেতর প্রায় অচৈতন্যের মতো লুৎফুন্নেসা বললে, 'আর না মকবুল আর না–

আমি বললাম, আরো, আরো।

লুৎফুন্নেসা ঘড়ঘড়ে গলায় যেন অনেক দূরে থেকে বললে, 'তুমি তো আর আমার পাপুকে দেখোনি না? কতোদিন দেখিনি। এতোদিনে সে কত বড়ো হয়ে গেছে।'

www.nagorikpathagar.org

মাহমুদুল হকের গল্প কিংবা উপন্যাস নিছক কাহিনীমাত্র নয়– ঘটনাকে ছাড়িয়ে যায় ঘটনার পারিপার্শ্বিকতায় বুনে দেয়া তাঁর সম্মোহক গদ্যজাল। সেই অমোঘ জালে বাঁধা পড়ে যায় পাঠকের মন ও মনন। কিন্তু এই গদ্যজাল যে জীবনকে ছেঁকে তুলে আনে, তা বাংলাদেশের সোঁদামাটির গন্ধমাখা বাঙালি-সমাজেরই যাপিত জীবন। গ্রাম বাংলা আর শহর নগরের এক আশ্চর্য সাঁকো নির্মিত হয়েছে তাঁর অভিজাত ও অন্ত্যজ চরিত্রাবলির পদচারণায়।

ISBN 984 70209 0039 9
9 847020 900399